ছোটদের পরমাশ্চর্য পত্রিকা। প্রতি মাসের ৬ তারিখে
এপ্রিল ২০১২ □ ১০ টাকা

ছেলেবেলা



মায়ানমারে হঠাৎ দেখা রাখাল ছেলে



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ বিজয় বাসফরে

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

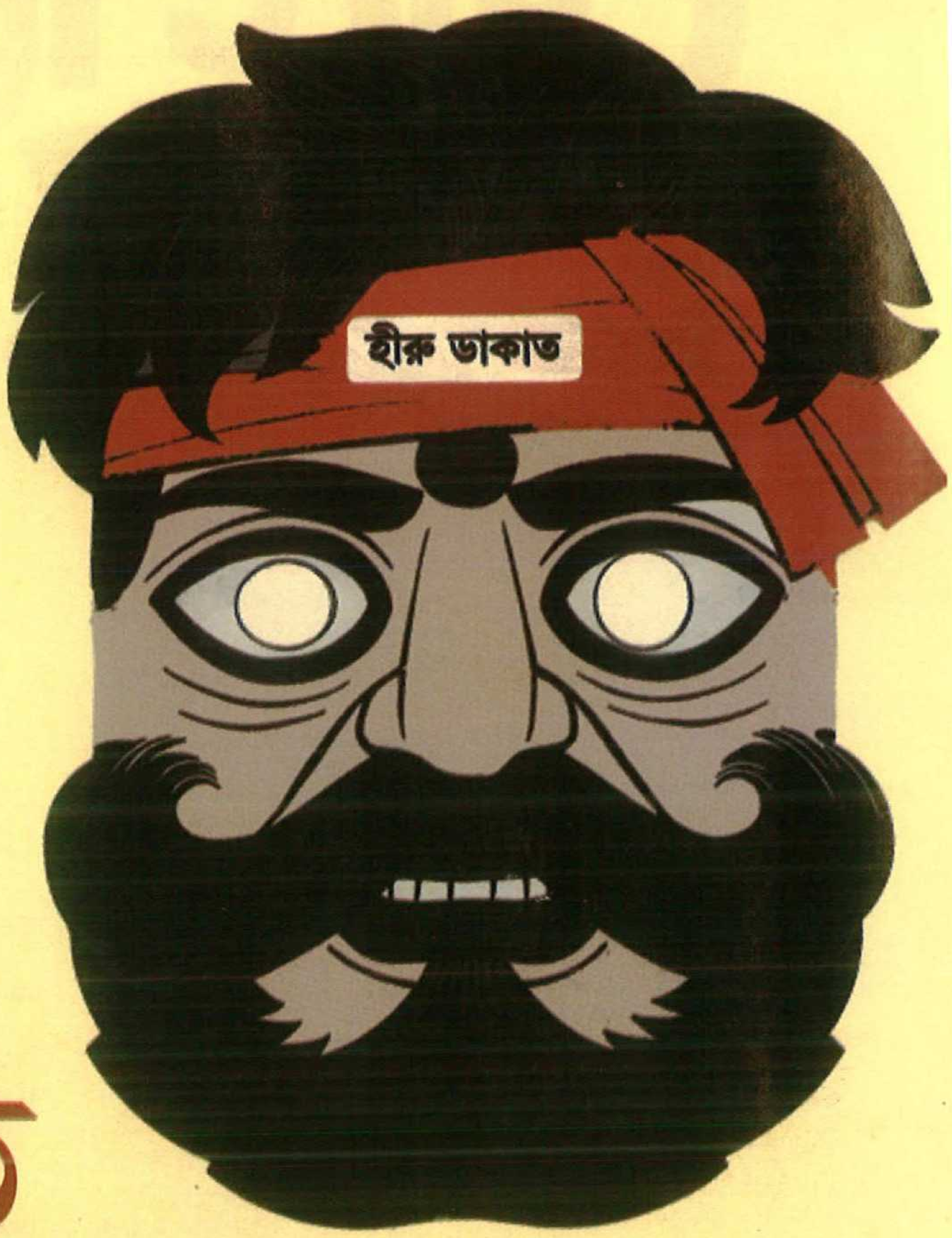
একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

এক আশ্চর্য বইয়ের পরমাশ্চর্য জোড়া সিডি

অবাক করা
গানে-সুরে
বাদ্যি-বাজনায়
অভিনয়ে
জমজমাট
জোড়া সিডি



হীরু ডাকাত

ছন্দে-কথায়, গানে-বাজনায়, অভিনয়ে-কথকতায়
অসাধারণ শ্রুতিনাটক

ছোটদের মস্ত বড় আনন্দের আয়োজন

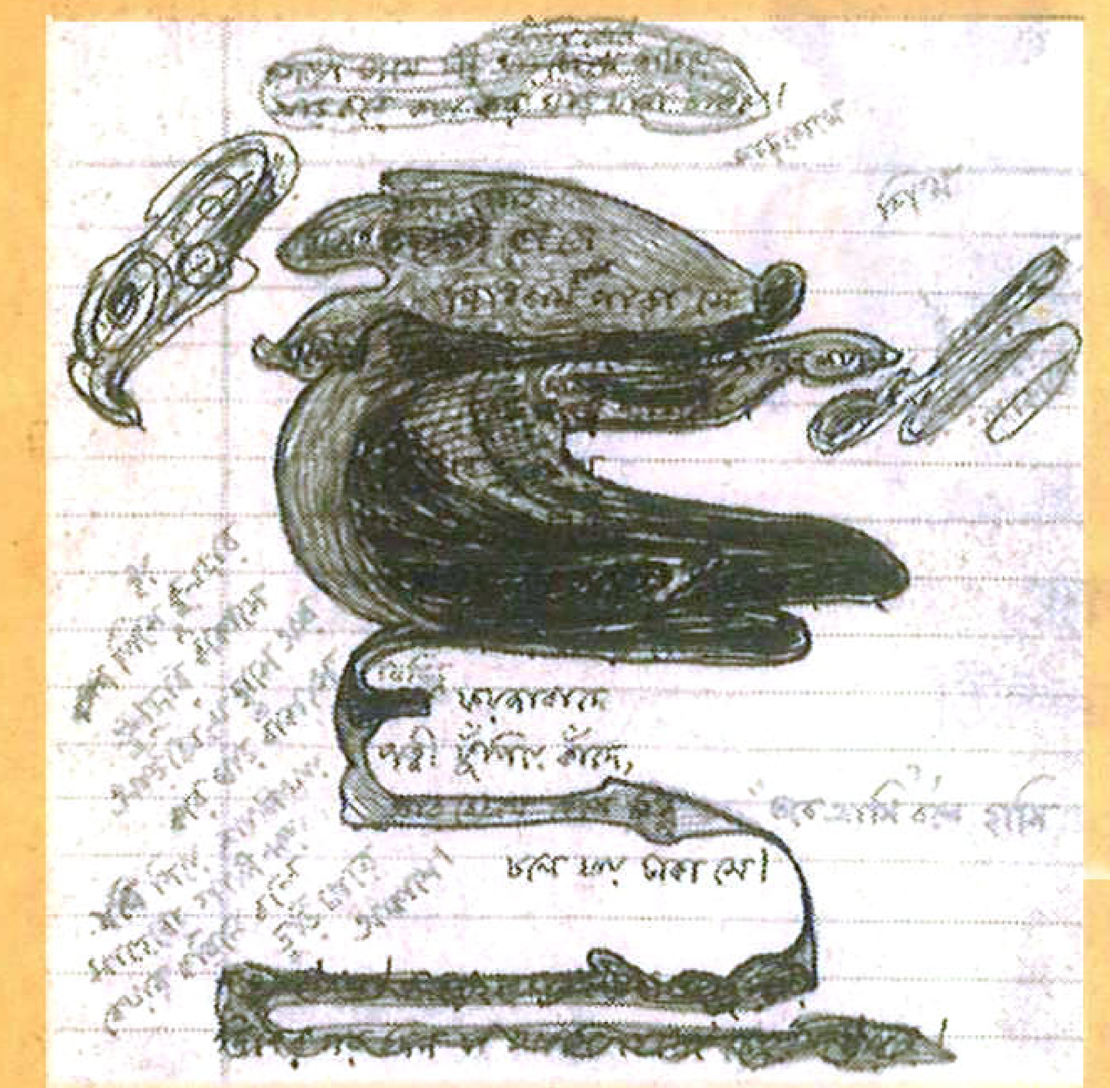
মূল রচনা ও শ্রুতিনাট্যরূপ: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
সংগীত ও পরিচালনা: দীপক চৌধুরী
অভিনয়: সন্তু মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়চৌধুরী ও আরও অনেকে
ভাষ্যপাঠ: অনসূয়া মজুমদার
গান: স্বপন বসু ও আরও অনেকে

সিম্ফনি, মিউজিক ওয়ার্ল্ড ও অন্যান্য ক্যাসেটের দোকানে পাওয়া যায়

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Private Limited, 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2280-8818 Fax: 2287-6448 Email: books@swarnakshar.in Website: www.swarnakshar.in

ছেলেবেলা

প্রথম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা এপ্রিল ২০১২ ২৩ চৈত্র-২২ বৈশাখ





















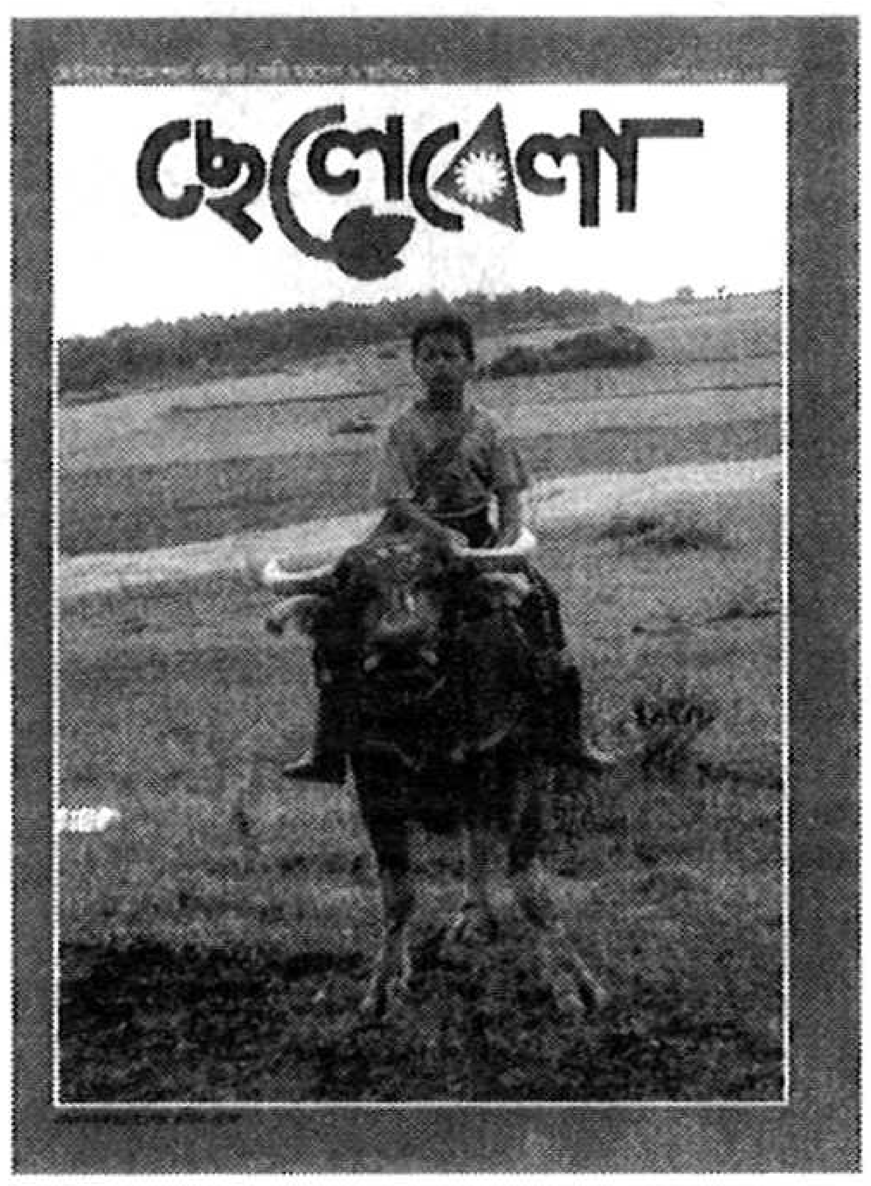












প্রচ্ছদ: মায়ানমারে কালোয়া থেকে পিন্ডায়া গুহা যাওয়ার পথে হঠাৎ দেখা এই রাখাল বালকের ছবিটি তুলেছেন অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

ছেলেবেলা স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: সম্পাদকীয় বিভাগ: ২২৯০-০০০৮, ২২৮৩-৫৫২৬, ৬৪১৪-৯৫১৪ বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন: ২২৮৩-২৩২০, ২২৮০-৮৮১৮, ৬৪১৫-৯৫৯৩ ফ্যাক্স: (০৩৩)২২৮৭-৬৪৪৮
E-mail : সম্পাদকীয়: chhelebela@swarnakshar.in বিজ্ঞাপন: advt@swarnakshar.in সার্কুলেশন: circulation@swarnakshar.in
Website: www.swarnakshar.in **Editor's Website:** www.amarendrachakravorty.com

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-১৯ থেকে প্রকাশিত ও স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ (মুদ্রণ বিভাগ), কসবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, ফেজ-২, প্লট-১৬, কলকাতা-১০৭ থেকে তাঁর দ্বারা মুদ্রিত।
সম্পাদক : অমরেন্দ্র চক্রবর্তী যুগ্ম সম্পাদক : মৈত্রেয়ী নাগ সাম্মানিক সহ সম্পাদক : শমীন্দ্র ভৌমিক



ছেলেবেলা

সম্পাদকের কথা

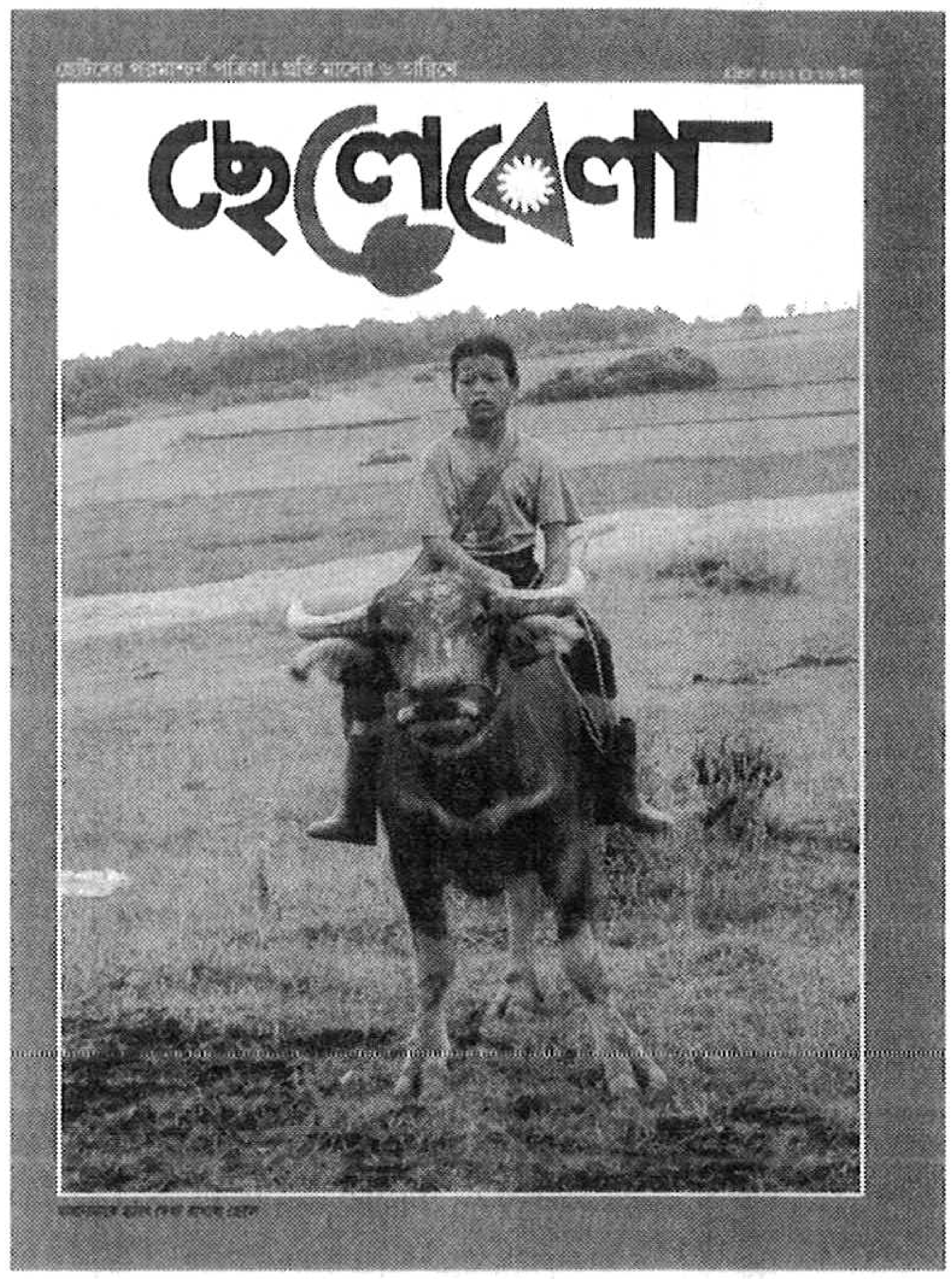
ছোটদের পত্রিকা 'ছেলেবেলা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৩র ৬ আগস্ট। খবরের কাগজের একটা পাতা মাঝখান থেকে ভাঁজ করলে যে মাপ হয় সেই মাপের চার পৃষ্ঠার 'ছেলেবেলা'র দাম ছিল ৪০ পয়সা। কম পাতা কম দামের উদ্দেশ্য ছিল ছোটদের পত্রিকা যাতে সব ছোটদের কাছে পৌঁছয়।

'ছেলেবেলা' প্রথম থেকেই পাঠকের মধ্যে সাড়া ফেলে দেয়। রোজপ্রকাশেরও বেশি চিঠিতে পাঠকের প্রশংসা আর আনন্দের বান ডাকত।

'ছেলেবেলা'য় আরেকটা খুব বড় আনন্দের ব্যাপার হয়েছিল। মস্ত বড় বড় লেখকরা ভালোবেসে 'ছেলেবেলা'য় গল্প ছড়া কবিতা লিখতেন। নামী শিল্পীরা ছবি আঁকতেন। এভাবে নয় সপ্তাহ প্রকাশিত হবার পর 'ছেলেবেলা'র দামে ও আকারে কিছুটা বদল হয়েছিল। তারপর অনেক দিন বাদে বাদে আর মাত্র চারটি সংখ্যা বেরিয়ে নানা কারণে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

সেই 'ছেলেবেলা' সবদিক থেকে নতুন হয়ে ফিরে এল। এবার রঙিন চেহারায়, পনেরো দিন পর পর।

চারদিকের সামাজিক-সাংস্কৃতিক দূষণের মধ্যে ছোটদের মনে একঝলক বিশুদ্ধ আলো-বাতাস বইয়ে দেওয়াই আমাদের স্বপ্ন। আমাদের বিশ্বাস, ছেলেবেলার অমলিন আনন্দের মধ্যে দিয়েই ছোটরা একদিন সত্যিকার বড় হয়ে উঠবে।



নবপর্যায়ে ট্যাবলয়েড আকারের পাক্ষিক 'ছেলেবেলা'র প্রথম পাঁচ সংখ্যা বিতরণের অসুবিধায় ঠিকমতো সব জায়গায় পৌঁছয়নি। অল্প সংখ্যক যাঁরা পেয়েছেন তাঁদেরও অনেকে পত্রিকার বেঢপ সাইজের জন্য সংগ্রহে রাখার অসুবিধার কথা জানিয়েছেন। সকলের অসুবিধার কথা ভেবে ওই পাঁচটি সংখ্যার কয়েকটি লেখা এই সংখ্যায় আবার ছাপা হল। এমনিতেই পাক্ষিক 'ছেলেবেলা'র চেয়ে এই মাসিক 'ছেলেবেলা'র পৃষ্ঠাসংখ্যা চারগুণ বেশি। সেই বাড়তি পাতার একভাগে আগের কিছু লেখা সাজিয়ে দেওয়া হল।

রবিঠাকুরের খাতা থেকে

না দেখা ছবি, না পড়া ছড়া

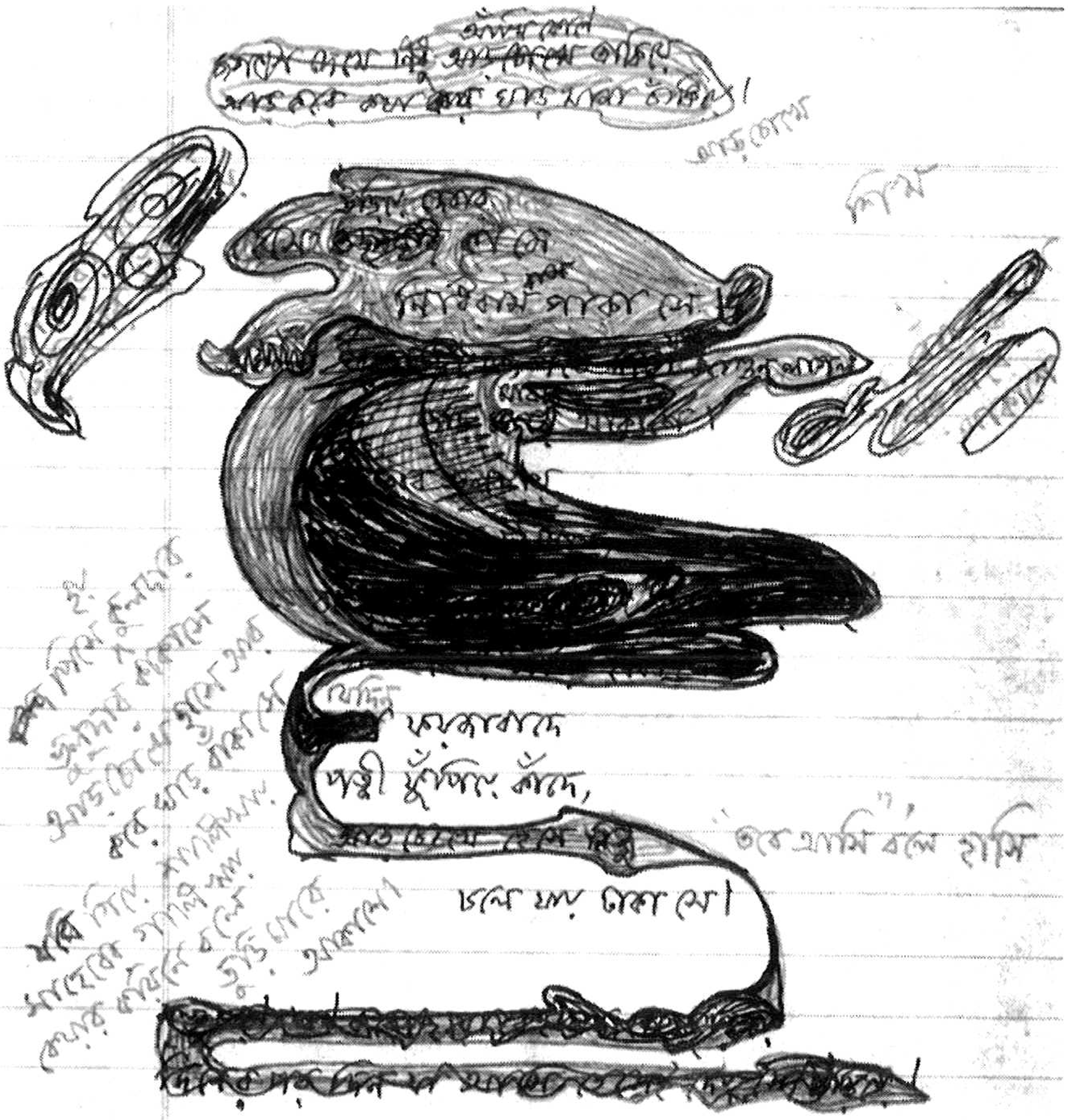
আড়চোখে বাঁকা হাসি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পিসে হয় কুলদার
ভুলুদার কাকা সে
আড়চোখে হাসে আর
করে ঘাড় বাঁকা সে।

যবে গিয়ে শালিখায়
সাহেবের গালি খায়
''কেয়ার করিনে'' বলে
তুড়ি মারে আকাশে।

যেদিন ফয়জাবাদে
পত্নী ফুঁপিয়ে কাঁদে
''তবে আসি'' ব'লে হাসি
চলে যায় ঢাকা সে।



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খাতা থেকে এই ছড়া ও ছবি এই প্রথম ছাপা হল। লিখতে লিখতে কোনও শব্দ বা অংশ তাঁর মনের মতো না হলে এমনভাবে সেগুলো কাটতেন যে সেই কাটাকুটিই ছন্দে-ছন্দে ক্রমশ একটা ছবি হয়ে যেত। সেইরকম একটা ছড়া আর তার কাটাকুটি ছবি এই কবিতার সঙ্গে প্রথম ছাপা হল। রবিঠাকুরের জন্মের দেড়শো বছর পরও তাঁর না-ছাপা কবিতা ও কাটাকুটি নিয়ে আমাদের আনন্দের সীমা নেই।

রবীন্দ্রনাথ এই কবিতার নাম দেননি। আমরা নাম দিলাম 'আড়চোখে বাঁকা হাসি'। অন্য কোনও নাম কারও মনে এলে এক্ষুনি লিখে পাঠাও। যাদের নামকরণ ভালো হবে তাদের প্রত্যেকের নাম ও তার দেওয়া কবিতার নাম 'ছেলেবেলা'য় ছাপা হবে।

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন, শান্তিকেতন-এর সৌজন্যে

পাঠকের কলম

চিঠি ১

'ছেলেবেলা'-র নবপর্যায়ের প্রথম সংখ্যাটি হাতে পেয়ে যারপরনাই আনন্দিত হলাম। বর্তমান সময়ে ছোটদের জন্য যে সমস্ত পাতা তৈরি হয় 'ছেলেবেলা' তাদের থেকে অনেকটা পৃথকভাবেই নিজেকে মেলে ধরতে সক্ষম হবে। এটি আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

নীলাদ্রিশেখর সরকার, *বেথুয়াডহরি, নদীয়া*

চিঠি ২

'ছেলেবেলা' মন ভালো করে দেওয়া পত্রিকা! সর্ব অর্থে রঙিন, এর দীর্ঘায়ু কামনা করি। আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

অনুনয় চ্যাটার্জি, *শিলিগুড়ি, দার্জিলিং*

চিঠি ৩



'ছেলেবেলা' ১৬ জানুয়ারি, ২০১২ পড়লাম। মন ছুঁয়ে গেল লেখায় এবং রেখায়। ভালো লাগল 'নীল পাহাড় পেরিয়ে'। 'পথের ডাক', 'ছেলেবেলা', 'চাঁদে গণ্ডগোল' মুগ্ধ করল। 'ছেলেবেলা'র প্রতিটি সংখ্যা আমাদের ছেলেবেলাকে ফিরিয়ে দেবে আশা করি।

বরুণ মণ্ডল, *শিক্ষক, শীল'স ফ্রি কলেজ*
১২৭, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

চিঠি ৪



১ মার্চের 'ছেলেবেলা' পড়লাম। কানাইলাল চক্রবর্তীর 'ছিল বউ, হল পাখি' বেশ ভালো লাগল। বিশেষ করে বউয়ের খোঁজে স্বামী পাখি হয়ে উড়ে বসল গাছের ডালে আর বলতে লাগল বউ কথা কও, বউ কথা কও— এটা পড়তে পড়তে ছেলেবেলার দিনগুলোর কথা মনে পড়ল। আমবাগানের পাতা সরিয়ে চুনি মার্বেল খেলছি আর কোকিল, শালিক, কাটঠোকরা, বউ কথা কও, চোখ গেল পাখিরা ডাকছে, তাদের নকল করে আমরাও ডাকছি। রেগে গিয়ে কোকিল আরও বেশি করে ডাকছে— এই গল্পটা পড়তে পড়তে যেন সেই দিনগুলোয় চলে গেলাম।

মেঘমালা, *বারুইপুর, পদ্মপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা*

চিঠি ৫

এই বৃদ্ধ বয়সেও ছোটদের জন্য লেখা খুব ভালো লাগে। 'ছেলেবেলা' খুব ভালো লাগছে।

সুরজিৎ মজুমদার, *কদমতলা, শিলিগুড়ি*

চিঠি ৬

নবপর্যায়ের 'ছেলেবেলা'-র প্রথম সংখ্যা থেকেই পড়ার সুযোগ হয়েছে। অপূর্ব ও অসাধারণ এক পত্রিকা। পঞ্চম সংখ্যা হাতে পেয়ে তাতে এপ্রিল থেকে মাসিক পত্রিকা হিসেবে বেরবার বিজ্ঞপ্তি দেখে আরও আনন্দিত হয়েছি। কারণ, এবার থেকে 'ছেলেবেলা' মলাট সহ প্রকাশিত হবে, ফলে তা সংগ্রহে রাখতেও সুবিধে হবে।

দেবলীনা পাল, *সন্দেশখালি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা*

চিঠি ৭



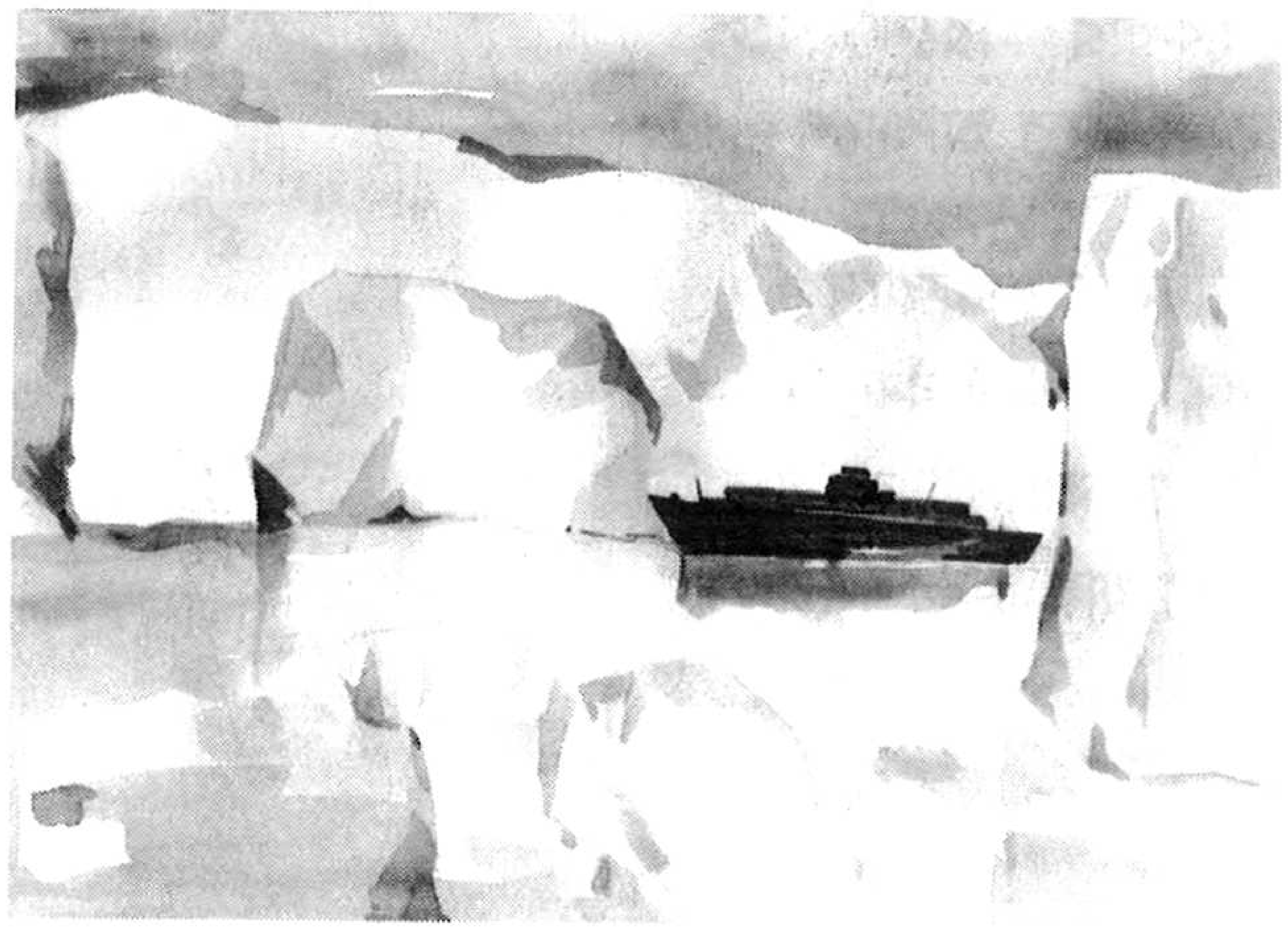
সদ্য কৈশোরে পা দেওয়া সেই মুহূর্তগুলির কথা মনে পড়ে। 'টিয়াগ্রামের ফিঙে নদী', 'শাদা ঘোড়া' পড়ার পর এক মুগ্ধ হয়েছিলাম। 'আমাজনের জঙ্গলে' পড়ার পর সেই মুগ্ধতা কমেনি, বরং বেড়েছে।

সেই অমরেন্দ্র চক্রবর্তী যখন সম্পাদনা করবেন ছোটদের একটি পত্রিকা, তাঁর অনেকখানি জুড়ে থাকবে তাঁর সুচিন্তিত পরিকল্পনা এটা প্রত্যাশিতই এবং তা যে অনায়াসে জয় করে নেবেন ছোটদের মন তাও বলার অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু তার চেয়েও বড় প্রাপ্তি এখানেও তাঁর জাদু কলমের আশ্চর্য ছোঁয়া।

'ছেলেবেলা'র সাম্প্রতিকতম সংখ্যাটি (১৬ মার্চ ২০১২) স্কুলে নিয়ে গিয়েছিলাম। ছাত্রদের পড়ে শুনিয়েছি ঈশপের গল্প অবলম্বনে পবিত্র সরকারের 'বন্ধু কে?' ছড়াটি। তাঁরা খুব আনন্দের সঙ্গে বিষয়টি উপলব্ধি করেছে আর তাদের মধ্যেই আমি খুঁজে পেয়েছি আমার ছেলেবেলাকে।

মামুল হাসান, *গোলাপবাগ, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ*

চিঠি ৮



'ছেলেবেলা' প্রথম সংখ্যা থেকেই পড়ছি। 'বরফের বাগান' ধারাবাহিকভাবে পড়তে পেয়ে যারপরনাই খুশি হয়েছি। প্রত্যেক কিস্তিতে কী ঘটবে তার জন্য উৎকণ্ঠা এবং সাগ্রহ প্রতীক্ষায় থাকি। 'ছেলেবেলা' পত্রিকা বাড়িতে রাখা হয় আমার কিশোরী কন্যার জন্য, কিন্তু তা আমাদের মতো পরিণত মনস্কদেরও যথেষ্ট আনন্দ দিচ্ছে। লে-আউটও খুব দৃষ্টিনন্দন।

পারমিতা দত্ত, *রিষড়া, হুগলি*

চিঠি ৯

'ছেলেবেলা' চমৎকার প্রকাশনা।

এ বুলবুল হাসান
এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, নিউইয়র্ক

অঙ্ক-স্যারের ডাকাত বাবা

লেখা ও ছবি : চণ্ডী লাহিড়ী



আমার অঙ্কের স্যার কাশীনাথ ঘোষালের বাবা ছিলেন বিখ্যাত ডাকাত। লাঠি খেলায় ওস্তাদ। অগ্রদ্বীপ, পাটুলি, পূর্বস্থলী কাটোয়া অঞ্চলে তাঁর প্রচুর সাকরেদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স অন্তত ১২৫ বছর হত। তাঁর ওপর পুলিশের নির্দেশ ছিল, তিন ফুটের বেশি লম্বা লাঠি ব্যবহার করতে পারবেন না। পুলিশের নোটিস বাড়ির দেওয়ালে লাগানো ছিল। তিনি এত ভালো লাঠি ঘোরাতেন যে পুলিশের গুলি লাঠিতে লেগে ছিটকে যেত। একবার ডাকাতি করার সময়, তাঁর এক সাকরেদ আহত হয়। পুলিশ তাকে ধরতে এলে স্যারের বাবা লাঠি ঘোরাতে শুরু করেন। শেষপর্যন্ত লাঠির জয় হল। পুলিশের গুলি ডাকাত সর্দারের গায়ে লাগল না।

স্যারের বাড়ি যেতাম অঙ্ক শিখতে। স্যারের বাবা একজন সত্যিকার ডাকাত। আমি সামনে বসে ভয়ে ঠক্‌ঠকক্ করে কাঁপতাম। ফলে অঙ্কে কাঁচা থেকে গেলাম। লাঠির নাম ছিল রেগুলেসন লাঠি। ডাকাতি বন্ধ করার জন্য ইংরেজ-সরকার তিন ফুটের বড় লাঠি নিষিদ্ধ করেছিল।

বেড়ালগুহার রহস্য



জাপান দেশের গল্প ফিরে শোনাচ্ছেন **মৈত্রেয়ী নাগ**



পাড়ায় ঢোকার মুখেই যে খেলার মাঠ, একদল বাচ্চা সেখানে বল খেলছিল। হঠাৎই বলটা একটা বাচ্চার হাত গলে বেরিয়ে গিয়ে গড়াতে গড়াতে গড়াতে গড়াতে এক্কেবারে হাপিশ হয়ে গেল।

বাচ্চারাও অমনি ছুটোছুটি করে চারদিকে খুঁজতে লাগল, কিন্তু বলের আর দেখা পাওয়া গেল না। শেষমেশ হাল ছেড়ে দিয়ে তারা যখন বাড়ি যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, তখন একজন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। তাই শুনে সবাই ছুটে এসে দেখে মাঠের ধারের ঝোপঝাড়ের মধ্যে বিশাল গভীর এক গর্ত। দেখে তো সবাই থ। অত বড় একটা গর্ত ওখানে কে খুঁড়ল?

সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে চোখ গোল গোল করে বাচ্চারা বড়দের বলল সেই গর্তের কথা। সব শুনে বড়রা দল বেঁধে দেখতে গেল ব্যাপারটা কী। ব্যাপার দেখে ছোটদের মতোই বাবা-মায়েরাও দাঁড়িয়ে রইল চোখ গোল করে। এত বড় গভীর গর্ত কেন ওখানে কেউ জানে না? সবাই চেয়েই রইল, গর্তে নেমে বল নিয়ে আসার সাহস কারুর হল না।

পরদিন মাঠের চারধারে পাঁচিল তুলে দেওয়া হল আর পাঁচিলের গায়ে বোর্ড টাঙিয়ে লিখে দেওয়া হল এখানে খেলা নিষেধ।

এদিকে বড়দের মধ্যে একজন, তাঁর নাম বোধহয় মোৎসুহিতো বা ওই ধরনের খটমট কিছু, বাচ্চারা তাঁকে বলে মোহিতোবাবু। তিনি পাড়ায় নতুন এসেছেন, পেশায় আঁকিয়ে। অন্যদের সঙ্গে তিনিও দেখেছেন গর্তটা আর তারপর থেকেই তাঁর খুব ইচ্ছে একবার গর্তে নেমে দেখেন কী আছে ভিতরে। তাই একরাতে, কাউকে কিচ্ছু না জানিয়ে লম্বা একগাছা দড়ি নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি থেকে। পাঁচিল টপকে মাঠে ঢুকে গর্তের কাছে গিয়ে একটা খুঁটি পুঁতে দড়ি দিয়ে কপিকলের মতো ব্যবস্থা করে দড়িটা ধরে ঝুলে পড়লেন।

মোহিতোবাবু অন্ধকার গর্তের মধ্যে নামছেন তো নামছেনই। ঠান্ডা নেই হাওয়া নেই শব্দ নেই গন্ধ নেই। শেষ পর্যন্ত পা যখন মাটিতে ঠেকল, শিল্পী মোহিতোবাবু দড়ি ছেড়ে চোখ মেলে দেখেন অবাক কাণ্ড! তিনি দাঁড়িয়ে আছেন একটা শহরের মধ্যে, পাথর কেটে তৈরি একটা শহর, জনমানব নেই, সাদা রঙের নীরব এক পাতালপুরী। চারদিকে শুধু ভেঙে পড়া ঘরবাড়ি, সাদা ধুলোয় ঢাকা। যেন ভূমিকম্প বা অন্য কোনও ধ্বংসের পর সবাই বাড়িঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে।

চারদিকে খালি ভেঙে পড়া দেওয়াল, ফাটল ধরা কাচ আর ঝুলে পড়া দরজা। রাস্তায় একটা লোক নেই। শুধু এক অদ্ভুত নীরবতা।

মোহিতোবাবু ভাঙাচোরা পাথর উল্টেপাল্টে দেখেন, কখনও বা চেঁচিয়ে ডাকেন যদি কোথাও প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে থাকেন, কিন্তু কাউকে দেখেন না। একসময় ঘুরতে ঘুরতে তিনি এসে পড়েন একটা আস্ত বাড়ির সামনে। তার দুয়োরে দেখেন একটা মেয়ে হাঁটুতে মাথা রেখে বাচ্চাদের মতো কাঁদছে।

গল্পের শেষটুকু ৫৬ পাতায়

দুধ দেওয়া পাখি

আফ্রিকা মহাদেশের একটি প্রাচীন গল্প, ফিরে শোনাচ্ছেন অদিতি চট্টোপাধ্যায়



অনেকদিন আগে আফ্রিকায় থাকত একটি লোক, তার বউ আর দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে। তাদের বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে, বনের মধ্যে এক জায়গায় গাছভরা খুব ভালো ভালো রসাল ফল পাওয়া যেত। সারা গ্রামে একমাত্র এই লোকটিই জানত ওই জায়গাটার কথা। লোকটা ফল চিনতও খুব ভালো। সে সারাদিন ধরে ফল কুড়িয়ে এনে, সন্ধ্যায় বউ ছেলে মেয়েকে নিয়ে মজা করে সেই মিষ্টি, রসাল ফল খেত। এইভাবেই তাদের দিন কাটছিল।

একদিন, লোকটি গিয়েছে বনে ফল কুড়োতে। গিয়ে দেখে এক আশ্চর্য পাখি। লম্বা লম্বা ঘাসের ভিতর থেকে মাথার একটুখানি দেখা যাচ্ছে। পাখিটা বেরিয়ে আসতেই দেখা গেল তার মাথায় লাল সবুজ পালক, গলাটা দুধসাদা, পুরো পেটটা লাল, আর পায়ের রং সাদা আর কালো। লোকটা অবাক হয়ে গেল। এত বছর ধরে আসছে এখানে, এমন পাখি তো কখনও দেখেনি! লোকটা পাখিটাকে দেখে এতই মুগ্ধ হয়ে গেল যে, ফল পাড়ার কথা ভুলেই গেল। ঠিক করল পাখিটাকে নিয়ে তবে সে বাড়ি ফিরবে।

লোকটা পাখিটাকে দেখতে পেলেও, পাখিটা কিন্তু লোকটিকে দেখতে পায়নি। সে নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। লোকটা পাখিটার পিছু নিল। মনে মনে খুবই ভয় হচ্ছিল, পাখিটা তাকে দেখতে পেয়েই আবার উড়ে না চলে যায়! তাই খুব সন্তর্পণে গুঁড়ি মেরে পাখিটার দিকে এগোতে লাগল। এক সময় সে পাখিটার একেবারে কাছে এসে পড়ল। খানিকক্ষণ ওভাবে চুপটি করে থেকে হঠাৎই বিরাট এক লাফে পাখিটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাকে ধরে ফেলল। কিন্তু পাখিটার রকম-সকম দেখে লোকটি তো অবাক। তার পালিয়ে যাওয়ার কোনও চেষ্টাই নেই। শরীর, ডানা নিথর করে পড়ে রয়েছে তার হাতের তলায়। কাজল পরা চোখ দুটি তুলে, একবার মাত্র পিটপিট করে তাকাল লোকটার দিকে। লোকটা তাড়াতাড়ি তার ঝোলার মধ্যে পুরে নিল পাখিটাকে। বাড়ি ফিরে, সে বউকে পাখিটা

দেখাতেই চমকে উঠল তার বউ— 'এ তো সাধারণ পাখি নয়; এ পাখি যে দুধ দেয়!' 'পাখি দুধ দেয়?' আশ্চর্য হয়ে গেলেও অবিশ্বাস করতে পারল না লোকটি। কারণ তার বউয়ের বাবা ছিল পক্ষিবিশারদ। তার মেয়ে তো আর ভুল কথা বলবে না।

বউটি চট করে একটা লাউয়ের খোলের তৈরি পাত্র এনে পাখির সামনে রাখতেই খোলাটা কানায় কানায় সুগন্ধি, মিষ্টি দুধে ভরে গেল। তারা আনন্দ করে পেট ভরে সেই দুধ খেল। তারপর শুতে যাওয়ার আগে, যে ঘরটা তারা কেউ ব্যবহার করত না, পাখিটাকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

পরদিন সকালে দুধ খেয়ে ভাই-বোন দুজনেই অবাক হয়ে গেল। তারা আগে কখনও এত ভালো দুধ খায়নি। খুশি হয়ে দু'জন সবটা দুধ খেয়ে ফেলল। এরপর থেকে তাদের আর কোনও খাওয়ার কষ্ট থাকল না। আর রোজ রোজ ভালো দুধ খেয়ে দুই ভাই-বোন এত সুন্দর বেড়ে উঠতে লাগল যে, প্রতিবেশীরা চেয়ে চেয়ে দেখত তাদের।

একদিন তারা মাকে জিজ্ঞেস করল, 'মা কোথা থেকে তুমি দুধ আনো? আমাদের কি কোনও লুকোনো গরু আছে?' পাখির দুধ শুনে বাচ্চারা যদি খেতে না চায়, তাই মা মিষ্টি হেসে উত্তরটা এড়িয়ে গেল। বাচ্চারা আবার জিজ্ঞেস করল, আবার বউটি উত্তর দিল না। এরকম চলতেই থাকল। শেষে একদিন ছোট্ট মেয়েটা একটা বুদ্ধি বের করল। দাদাকে গিয়ে বলল, তারা পরদিন সকালে একটা বাটিতে একটু দুধ বাইরে রেখে আসবে। যে পশু এসে এই দুধ খাবে, বোঝা যাবে দুধ তারই। যেমন কথা তেমনি কাজ। পরদিন দুধ রেখে দুই ভাই-বোন লুকিয়ে নজর রাখল ঝোপের আড়াল থেকে। প্রথমে একটা হায়না এল। দুধের গন্ধ শুঁকল। চলে গেল। তারপর এল একটা বেবুন। সেও খুব নজর করে দেখল দুধটুকু। কিন্তু স্পর্শও করল না। প্রায় পিছন পিছন এল একটা পাহাড়ি খরগোশ। তারও দুধ খাওয়ার কোনও উৎসাহ দেখা গেল না। অবশেষে একটা পাখি এসে বসল এবং দুধের বাটিতে ঠোঁট ডুবিয়ে দিল। তারপর একে একে অনেক পাখি উড়ে এল দুধ খেতে। তখন তারা বুঝল, এই দুধ আসলে পাখির।

সঙ্গে সঙ্গে তারা ঠিক করল, তাদের দেখতেই হবে কোন পাখিটা তাদের দুধ দেয়। তাই পরদিন সকালে উঠে, তারা লুকিয়ে বসে রইল মা কোথায় যায় দেখতে হবে। দেখল, মা বাড়ির পড়ে থাকা, খালি ঘরটায় ঢুকল আর যখন বেরিয়ে এল তার হাতে লাউয়ের খোলের পাত্রভরা দুধ। তারা ঠিক করল, বাবা-মা যখন মাঠে যাবে, তখন তারা পাখিটাকে দেখবে। সেদিন দুপুরবেলায় বাবা-মা মাঠে যাওয়ার পর তারা খুব সাবধানে ওই ঘরটায় ঢুকে চারপাশ দেখতে লাগল। অন্ধকার সয়ে আসতেই চোখে পড়ল পাখিটাকে। কিন্তু পাখিটার কাছে আসতেই মন খারাপ হয়ে গেল তাদের। ছেলেটা জানত, দুধ-পাখিরা খুব সুন্দর রং-চঙে হয়। কিন্তু এই পাখিটা একেবারে বিবর্ণ। পাখিটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'এই অন্ধকার ঘরে থেকে থেকে আমার সব রং চলে গিয়েছে। আমায় একটু সূর্যের আলোয় নিয়ে যাবে? তাহলেই আমার সব রং ফিরে পাব।' বাচ্চাদুটি তক্ষুনি রাজি হয়ে গেল। তারা খাঁচা থেকে বাইরে বের করে এনে, একটা গাছের নিচু ডালে পাখিটাকে রাখল। দেখতে দেখতে পাখিটার পালক আবার রঙিন হয়ে গেল। পাখিটাও তাদের একটা ছোট্ট ধন্যবাদ দিয়ে, ফুড়ুৎ করে পালিয়ে গেল। ভয়ে কাঠ হয়ে গেল দুজনে। বাবা-মা জানতে পারলে কিছুতেই তাদের ক্ষমা করবে না। ছেলেটা ঠিক ওরকম একটা পাখির খোঁজে পাহাড়ে গেল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও দুধ-পাখি পাওয়া গেল না। ফেরার পথে একটা ঝোপের ধারে ছেলেটা দেখে, প্রায় ওই পাখিটার মতো দেখতে একটা পাখি, কিন্তু দুধ-পাখি নয়। ছেলেটা ওটাকেই এনে চুপিচুপি রেখে দিল ঘরে।

রাতে বউটি যখন লোকটিকে দুধ এনে দিল লোকটি অবাক হয়ে বলল, 'এ তো দুধ নয়, জল। পাখিটা জল দিচ্ছে কেন?' বউটি কিছুই বুঝতে না পেরে আবার পাখিটার থেকে দুধ বের করার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু আবারও জল দিল। বউটি কপাল চাপড়ে বসে পড়ল।

পরদিন সকালবেলা বাবা-মাকে পাখিটার জন্য কান্নাকাটি করতে দেখে বাচ্চাদুটি আরেকটা পাখির খোঁজে বেরোল। কারণ, পাখিটাকে খুঁজে না পেলে তাদের বলতেই হবে আসল ঘটনা, আজ হোক বা কাল। খুঁজতে খুঁজতে তারা এক জায়গায় এসে দেখে কতগুলি ছেলে উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করছে। বাচ্চাদুটি দৌড়ে যায় সেখানে। দেখে ছেলেগুলি একটা পাখিকে ঘিরে ধরে ঢিল মারছে, আর নানারকম বাজে কথা বলছে। এই নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখে ছেলে-মেয়েদুটি খুব রেগে গেল। দুটো লাঠি জোগাড় করে নিয়ে তারা ছেলেগুলিকে তাড়িয়ে দিল। আর ছেলেগুলি চলে যাওয়ার পর, ভয়ে মাটিতে পড়ে কাঁপতে থাকা পাখিটাকে দেখেই তারা চিনতে পারল— এই তাদের সেই পালিয়ে যাওয়া দুধ-পাখি। পাখিটাকে আলতো করে তুলে নিয়ে বাবা-মায়ের চোখ এড়িয়ে, আগের জল দেওয়া পাখিটার জায়গায় রেখে দিল। জল পাখিটা মনের সুখে উড়ে গেল।

দুধ-পাখিটা এরপর থেকে আর কখনও পালাবার চেষ্টা করেনি। বরং তাকে বাঁচানোর জন্য কৃতজ্ঞতায় আগের থেকেও মিষ্টি দুধ দিতে থাকল। শেষে একদিন, যখন বাচ্চাদুটো বড় হয়ে বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গেল, দুধ-পাখিও তখন মনের দুঃখে দূরে কোথায় উড়ে গেল। অন্ধকার ঘরের মেঝেতে শুধু পড়ে রইল কিছু রং-ওঠা পালক।

ছবি: শান্তনু দে



ছেলেবেলা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বছর-দশের যে-ছেলেটা এসে
দাঁড়িয়েছে জানালাতে
পাতায়-পাতায় জলছবি-সাঁটা
অঙ্কের বই হাতে,
কপালটা ফুলো দেখে তাকে ডেকে
বলে ফেলি খোলাখুলি,
"নিষেধ না মেনে আজও তুই ফের
খেলেছিলি ডাংগুলি?"
সে বলে, "খামোখা বকাঝকা করো,
সবাইকে আছে চেনা!
সব বাচ্চাই ডাংগুলি খেলে,
তুমিই কি খেলতে না?
কাচ গুঁড়ো করে মাঞ্জা বানাতে
তোমারও ছিল না জুড়ি,
ওই ন্যাড়া ছাতে লাটাইটা হাতে
তুমিও ওড়াতে ঘুড়ি।"
শুনে তো আমার কথাই সরে না,
এ যে দেখি সব জানে,
এ-সব কথা না উঠে যায় শেষে
পাড়াপড়শির কানে।
যত ভাবি এটা, তত আতঙ্কে
দরদর করে ঘামি,
শেষে হাঁফ ছেড়ে বুঝি যে, এ সেই
দশ-বছরের আমি!



ছবি: শুভাপ্রসন্ন

পাক্ষিক 'ছেলেবেলা'-র প্রথম পাঁচ সংখ্যা থেকে

চ্যাংড়া ভূতের গল্প

মহাশ্বেতা দেবী



তিনি যখন বললেন, ভূতের গল্প লিখতে হবেই হবে, আমি খুবই খুশি। কিছুকাল ধরেই মনে হচ্ছে, আমার ছোটবেলা থেকে শোনা ভূতের গল্পগুলো লিখে ফেলা দরকার। বস্তুত এটা খুবই দরকারি কাজ হবে। সেই চেষ্টাই করব বলে কলম ধরেছি।

আমাদের গ্রাম নতুন ভারেঙ্গায় আমরা পুজোর আগেই যেতাম। বাড়িতে পুজো হত। আমরা নদীর দেশের মানুষ। বড় নদী, ছোট নদী, খাল-বিলের দেশ। ডাকের সাজের জাঁকালো প্রতিমা হত না। কুমোর এসে মাটির ঠাকুর গড়ত। আমাদের গ্রামে বেশ কয়েকটা পুজো হত। সব ঠাকুরই মাটির। সাজসজ্জাও মাটির। সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে চ্যাংড়া, অর্থাৎ না-বালক, না-শিশু ভূতদের কথা। ভারেঙ্গা গ্রামের জল-বাতাসে কি গুণ ছিল জানি না। ওই বয়সের ছেলেপিলে যারাই মরে যেত, তারা কেউ গ্রাম ছেড়ে যেত না।

রাকশা, বকচর, এসব গ্রামের হাট থেকে হাট সেরে মানুষ ফিরত। সকলে হেঁটেই ফিরত। সেরকমই রেওয়াজ ছিল। হাঁটা-পথের দু'পাশে ছিল বাঁশবন।

সে পথ দিয়ে হাটুরেরা ফিরত, আর চ্যাংড়া ভূতেরা হাটুরেদের থলি থেকে আখ, শসা, কুল, পেয়ারা হরদম চুরি করত।

এরাই ছিল চ্যাংড়া ভূত। অর্থাৎ ভূত-সমাজে নাবালকরা। 'ভূত-সমাজ' শুনে কেউ হেসো না। মানুষের মধ্যে বেজায় বুড়ো থেকে বেজায় ছোট, সবাই থাকে। ভূত-সমাজেও নিয়মরীতি আছে। বলছি 'আছে', বলতে চাইছি, আমার ছোটবেলায় 'ছিল'। চ্যাংড়া ভূতরা ফল চুরি করত, জেলেদের ভয় দেখাত, 'মাছ দে' বলে। আমরা শুনতাম, সূর্য ডুবলে কেউ বাইরে থেকো না। তখন চ্যাংড়া ভূতের উপদ্রব।

আমাদের বাড়ি ঘটক-বাড়ি। মামাদের বাড়ি চৌধুরী-বাড়ি। মামা বাড়িতে মায়ের খুড়তুতো ভাই তেজুমামা আর আমি কাছাকাছি বয়সি। ফলে দু'জনে বেজায় বন্ধু। গাছের ডাল থেকে পুকুরে ঝাঁপাই, ছিপ দিয়ে মাছ ধরি, ইত্যাদি ভালো ভালো কাজ করি।

তেজুমামার আরও বড় গুণ ছিল, সে চমৎকার সাঁতার কাটত। নদীনালার দেশে সাঁতার কাটে সবাই। তেজুমামা

বছরে একবার বা দু'বার ভেলকি দেখাত। দুর্গাপুজোর পর ঠাকুর বিসর্জন হল তো সঙ্গে সঙ্গে তেজুমামা সকলের সঙ্গেই ঝাঁপাবে আর ঠাকুরের কানের কুণ্ডল বা মাথার মুকুট, কিছু একটা তুলে আনবে।

চ্যাংড়া ভূতেরা তারপর আসবেই আসবে। গাছ থেকে হোক, বাঁশঝোপ থেকে হোক, তারা বলবেই, 'ও বাম্‌না! মায়ের মাথার মটুক দে! মটুক না থাকে, কানের মাকড়ি দে!'

তেজুমামাও কম যায় না। সে বলবে, চ্যাংড়া ভূতের মটুকের দরকার কি? পূজার মটুক না?

ওরা বলবে, পূজা তো হয়্যা গিছে!

তেজুমামা বলত, পূজা হয়্যা গিছে তাতে কি? মায়ের মটুক না?

—তাতে কি?

—বটের? টেঁক টেঁক কথা? তুই নিশ্চয় ভূষণ জোলার ছাওয়াল মলিন্দ!

—হ তেজ্ দা!

বলে চ্যাংড়া ভূত পালাত।

বুঝতেই পারছ, ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম! লাহিড়ী-ভাদুড়ী, সান্যাল-মৈত্র-চৌধুরী এমন সব বেজায় ছোট জমিদাররা পুজোয় বাড়ি আসতেন। ঘরে ঘরে পুজো হত। ফলে চ্যাংড়া ভূতরাও উপদ্রব করত।

সেবার শুনলাম, পুজোর আগেই ঝড় হয়েছে। বেশ কিছু নৌকো ডুবেছে। তার মধ্যে অন্তত দশ-বারোজন বালক ছিল। তেজুমামা পোস্টকার্ডে জানাল, 'তেনাদের উপদ্রব বাড়িয়াছে।' অর্থাৎ চ্যাংড়া ভূতদের।

আমার তো চ্যাংড়া ভূত দেখবার খুব শখ।

তা, পুজোয় গেছি। প্রতিবার যেমন যাই। যাওয়া মানে তো প্রথমে ট্যাক্সিতে শেয়ালদা, তারপর ট্রেন চেপে গোয়ালন্দ, তারপর স্টিমারে ওঠা, তারপর নৌকো চেপে সোনাপদ্মার খাল পেরিয়ে নতুন ভারেঙ্গা পৌঁছনো। গ্রামের ঘাটে নামলাম তো চারদিক থেকে পুজোর ঢাকবাদ্যি শুনতে পাব।

সে সবই হল। তেজুমামার গোঁফ উঠেও ওঠেনি গোছের। অভ্যেসমতো কান চুলকে তেজুমামা বলল, হারামজাদা ভন্তা খুব জ্বালাতেছে।

—কেন?

—ভন্তা তো বজ্জাত আছিল, সে মইরাও তেমনই আছে। এবারে নির্ঘাৎ মায়ের হাতের বর্শা চাইব।

—তুই কি করবি?

—দিমু আচ্ছা কইরা।

—কি দিবি?

—দেখিস্!

ও মা! সেবার বিজয়াদশমীর রাত থেকে ভন্তা এবং অন্য চ্যাংড়া ভূতদের কি উৎপাত শুরু হল।

—অ বামনা! মায়ের বর্শা দে!

—বামনা রে! মায়ের খড়্গাখান্ দিতে পারিস?

তেজুমামা গর্জে বলল, ঠাকুরের হাতের অস্তর না?

—কিয়ের ঠাকুর! পূজা হইয়া গিছে। তিনিও হিমালয়ে ফিরৎ গিছে। অহন আর ঠাকুর নয়।

—বেশ! দিমু! কাল আসিস।

—দিবি তো?

—নির্ঘাৎ দিমু।

চ্যাংড়া ভূতরা তো আনন্দে দিশাহারা। সে রাতে আর তারা এল না।

পরদিন তেজুমামা ওদের পোড়ো চালতাবাগানে অনেকগুলো পটকা বোম এনে ফেলল। পটকা বোমের বৈশিষ্ট্য হল আগুন ধরালে সেগুলো দুমদাম করে বিকট শব্দে ফাটবেই।

সন্ধের আগেই পটকা বোম বেশ কতগুলো জমল। মস্ত একটা ধুনুচিতে টিকের আগুন জ্বালিয়ে তেজুমামা তার পাঠশালার বন্ধু গদাই আর ছেনোকে নিয়ে বসল।

চ্যাংড়া ভূতরা নাকি বেজায় খুশি। আজ তারা মা দুর্গার হাতের ঢাল-তরোয়াল-বর্শা-সড়কি সব পাবে। নিয়ে কি করবে? বাঁশবনে যে যাবে তাকেই ভয় দেখাবে।

চ্যাংড়া ভূতরা সবাই এসেছিল। শুধু কি ভারেঙ্গার ভূত? রাকশা, বকচর, হেন তেন সব জায়গার ভূতেরা জড়ো হয়েছিল।

তেজুমামা বলল, ধুনায় আগুন দিছি, দেখ্ছস?

ক্যাঁ কোঁ, কিচিং মিচিং, হুক্কা হুয়া, নানারকম বিদঘুটে শব্দ করে ভূতেরা জানাল, হ্যাঁ! তারা দেখেছে।

—ওই আগুন ছোঁয়াবি, তবে নিবি।

—ক্যান্?

—ঠাকুরের হাতের অস্তর না? ওই ছোঁয়ান্ দরকার।

চ্যাংড়া ভূতরা তো সত্যিই নাবালক। মহানন্দে ওরা উড়ে উড়ে এসে দুর্গার ঢাল-তরোয়াল-বর্শা-সড়কি যে যেটা পারল তুলে নিল।

তেজুমামারা বোম বানাতে জানে। কালীপুজোয় বানায়। গদাই আর ছেনো এ কাজে ওস্তাদ।

চ্যাংড়া ভূতেরা যে যার মুঠোয় ধরা অস্তর নিয়ে এল সেগুলো আগুনে ছোঁয়াতে। গদাই, তেজুমামা আর ছেনো পটকা বোম ছুঁড়তে থাকল আগুনে।

ফলে যে দুমদাম আওয়াজ হল, তা ভাবতে পারবে না। চ্যাংড়া ভূতরা ভয় পেয়ে সব সাঁই সাঁই করে উড়ে পালাল।

সেই যে পালাল, আর তাদের দেখা নেই। বাকশার হাটের পর হাটুরেরা বলল, তেজুদাদা একখান কামের কাম করছে বটে! অহন হাট কইরা ফিরি, এট্টা চ্যাংড়া ভূতও কলা চুরি করে না। মানুষ ভূত দেইখা পলাত, অহন ভূতেরা মানুষ দেইখা পলায়।

ছবি: দেবব্রত ঘোষ

চোখের সামনে জলধর কুমোর দুর্গামূর্তি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, অসুর, সিংহ সব তৈরি করে চলে যেত। পুজোর সময় তাকে আমরা কোথাও দেখতে পেতাম না। সেসময় গণেশ ঠাকুর নিয়ে আমরা ছড়া কাটতাম—

‘গণেশ ঠাকুর গণেশ ঠাকুর
কানটি তোমার কুলো
জন্মের মধ্যে কম্ম কইরগা
খাইছ একটা মুলো...’

আমাদের দুর্গামূর্তি কলকাতার একালের মূর্তির তুলনায় বেশ সাদাসিধে হত, চালচিত্রে ঘেরা। পুজোয় আমাদের সমস্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা এসে মণ্ডপের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ত। পাঁঠাবলি হত। শুনেছি আমার কাকাবাবু যখন ছোট ছিলেন তখন মোষবলি হত। তিনি খুব দুরন্ত ছিলেন। বলির পর নাকি মোষের রক্ত গায়ে মেখে মাটিতে গড়াতেন। পুজোয় বিশেষ করে অষ্টমীর দিন বড় করে ভূরিভোজ হত। কলাপাতা পেতে ঠাকুরের ভোগ, তার সঙ্গে বেগুনভাজা, পাঁঠার মাংস আর পায়েস।

বিজয়া দশমীর দিন আমাদের মা, কাকিমা সবাই গরদের শাড়ি পরে মা দুর্গাকে সিঁদুর পরাতেন। মা দুর্গাকে ভাসান দেওয়া হত ঘাঘর নদীতে। নৌকো করে দেবীমূর্তিকে নেওয়া হত নদীর কাছে। অক্টোবরে আমাদের গ্রামগঞ্জে চারদিকে জল থইথই করত। আমরা সব নৌকোয় উঠতাম— ছেলে, বুড়ো সবাই। ছইওয়ালা নৌকো। যেখানে ভাসান হত সেখানে নৌকোয় নৌকোয় মেলার মতো নানান জিনিস বিক্রি হত। আমরা সবাই আখ কিনে খেতাম। সবার হাতে হাতে আখের টুকরো। জল থেকে কেউ কেউ শাপলা ফুল টেনে তুলতাম। কাছাকাছি জায়গা থেকে দুর্গামূর্তি আসত ভাসান দেওয়ার জন্য। সেই সময় একইসঙ্গে বাইচের নৌকো চলত নদীর ওপর দিয়ে। তার গলুইগুলো হত ময়ূরের মতো এবং নানা রঙে চিত্র-বিচিত্র। সেগুলি হইহই করে নদী বেয়ে জল ছেটাতে ছেটাতে এগিয়ে যেত। তাতে অসংখ্য মানুষ বৈঠা বেয়ে চলেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে চলছে ঢাক ও কাঁসার ঘণ্টার ঢংঢং করে অন্তহীন শব্দ ও মানুষের কলকোলাহল। মনে পড়ে যায়, ‘ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে’।

ভাসান শেষ হলে সবাই সঙ্গে জলের ঘট নিয়ে এসে জড়ো হত খালি পুজোর মণ্ডপে। আমরা এমনভাবে বসতাম যাতে পুরোহিত মশায় শান্তির জল ছেটালে আমাদের মাথায় এসে পড়ে। ওই সময় থেকেই বিজয়ার কোলাকুলি শুরু হয়ে যায় মণ্ডপের মধ্যে।

পরদিন আমরা ছোটরা বাড়ি বাড়ি যেতাম— সঙ্গে একটা করে ছোট কৌটো। আমাদের গ্রামে প্রায় ১০-১২ ঘর এবং পরিবার, সবাই আমাদের আত্মীয়। প্রত্যেক বাড়িতেই নারকোল নাড়ু, চিঁড়ের মোয়া এসব তৈরিই থাকত আমাদের জন্য। আমরা আমাদের দাদু, জ্যাঠা, কাকা, দিদিমা, জেঠি, কাকিমা, দাদা, বৌদিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নমস্কার করতাম আর কৌটো পেতে ধরতাম। আমাদের কৌটোয় কার কত নাড়ু আর মোয়ার স্টক বাড়ছে সেদিকেই আমাদের নজর।

এর পাঁচদিন পর পূর্ণিমার দিন লক্ষ্মীপূজা। সেই আটচালার পূজামণ্ডপেই। তার পনেরোদিন পর কালীপুজো, রাত জেগে। মাঝরাতে পুজো হয়। একবার আমি অনেকক্ষণ রাত জেগে সেই পুজো দেখেছিলাম।

লক্ষ্মীপুজোর পরেই আমাদের বাবা-কাকা-জ্যাঠারা প্রতিবছর থিয়েটার করতেন স্টেজ তৈরি করে। ওই সময় কলকাতা থেকে যারা আসত তারাও থিয়েটারে অংশগ্রহণ করত। পুজোর ছুটি থাকতে থাকতেই তাই এই প্রোগ্রাম হত। কিছুদিন ধরে খুব রিহার্সেল চলত বাবুলালদাদের বাড়িতে। খুব ভালো চা খাওয়া চলত, সঙ্গে নস্যি নিতেন অনেকেই। আমি বাবার সঙ্গে সেখানে গিয়ে বসতাম। মাঝেমধ্যে আমাকে একটু-আধটু চা দিত চায়না-বোন-এর কাপে। সে চায়ের ঘ্রাণ আমার এখনও নাকে লেগে আছে। সম্ভবত তা ছিল খাঁটি ‘দার্জিলিং টি’।

থিয়েটারের সময় আমাদের গ্রামের বাইরে থেকেও নানা লোকজন আসত দর্শক হিসেবে। স্টেজ তৈরির জন্য আমাদের অনেকগুলো আঁকা ‘সিন’ ছিল— গ্রামের দৃশ্য, শহরের রাস্তা, রাজপ্রাসাদের অন্দরমহল— এইসব বিষয় তাতে আঁকা থাকত। ড্রপসিনটি অর্থাৎ স্টেজের সামনের ‘সিন’টি ছিল আমার বাবার আঁকা। সেটা ছিল কৃষ্ণের কালিয়া দমনের ছবি। কৃষ্ণ সমুদ্রের মধ্যে সহস্র নাগিনীর মাথায় দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে। এই ‘সিন’গুলো আমাদের বাড়ির কাঠের দোতলায় রাখা থাকত। এইসঙ্গে থাকত থিয়েটারের জন্য ঢাল-তলোয়ার, তির-ধনুক— এইসব। বেশিরভাগ নাটকই হত ধর্মীয় কিংবা রামায়ণ-মহাভারতের গল্প নিয়ে। একবার ‘কর্ণার্জুন’ হল। তখন মেয়েদের চরিত্রে পাট করত ছেলেরাই। মেয়েরা কেউ স্টেজে উঠেছে এমন দেখিনি। এতে কুন্তীর পাট করেছিলেন আমার বাবা।

কালীপুজোর দুদিন পরেই ভাইফোঁটা। ভাইফোঁটা হয়ে গেলেই আমাদের আত্মীয়স্বজনরা যাঁরা কলকাতা থেকে এসেছিলেন তাঁরা সব একে একে ফিরে যেতেন। ছোটদের স্কুল খুলবে। বড়রা কাজে যোগ দেবে। আমাদের গ্রাম একটু খালি খালি হয়ে যেত তখন। আমাদেরও আটচালায় পাঠশালা শুরু হয়ে যেত। সেখানে নামতা পাঠ করতাম:

‘এক অক্ষে এক
দুই অক্ষে দুই
তিন দু’গুণে ছয়’... ইত্যাদি।

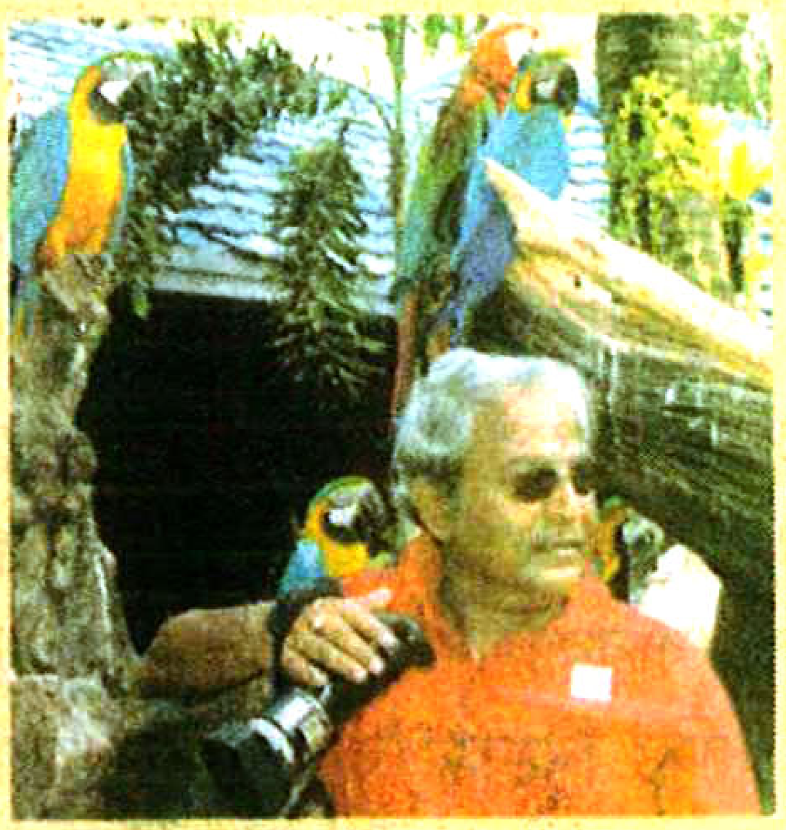
রবীন্দ্রনাথের কবিতাও সেই প্রথম পাঠ করি পাঠশালাতে:

‘আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে’।

একইসঙ্গে শুরু হয়ে যেত জল-জঙ্গল-মাঠ-ঘাটে ঘোরা, মাছ ধরা, গাছে চড়া— এই সব কিছুই।

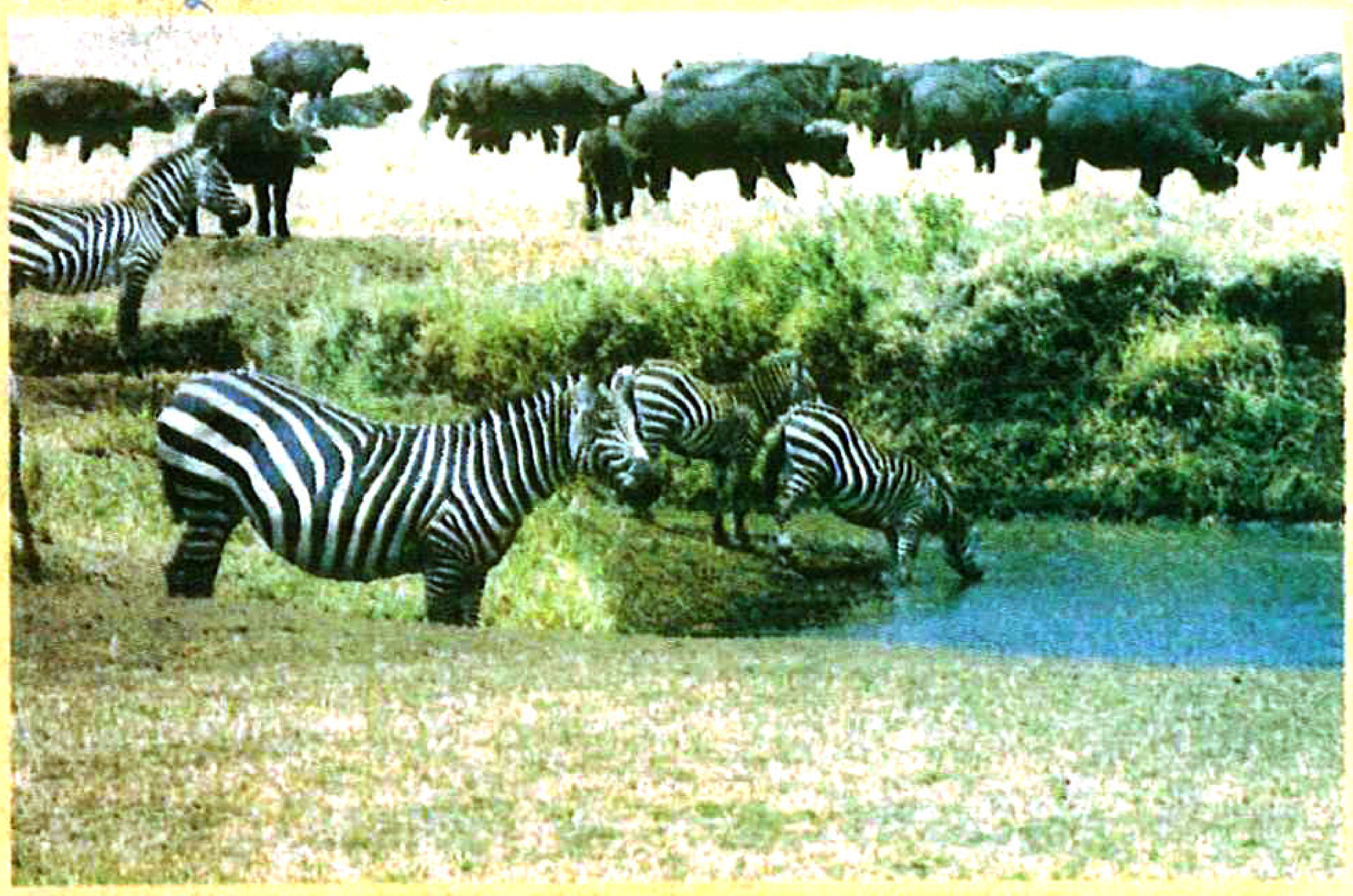
দূরের বন্ধু

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী



পৃথিবীর জলে-জঙ্গলে তুষারে-তৃণভূমিতে— যখন যেখানেই মানুষের এইসব আত্মীয়-বন্ধুদের দেখা পেয়েছি, কী যে আনন্দ পেয়েছি বলে বোঝাতে পারব না। দেখি আর ছবি তুলি। সেইসব দেখার আনন্দ তোমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতেই এই বিভাগ। তোমরাও এরকম ছবি তুলে পাঠাতে পারো। ছবি দেখে কিছু লেখার ইচ্ছে হলে লিখেও পাঠাতে পারো।

১৬ জানুয়ারির 'ছেলেবেলা' থেকে



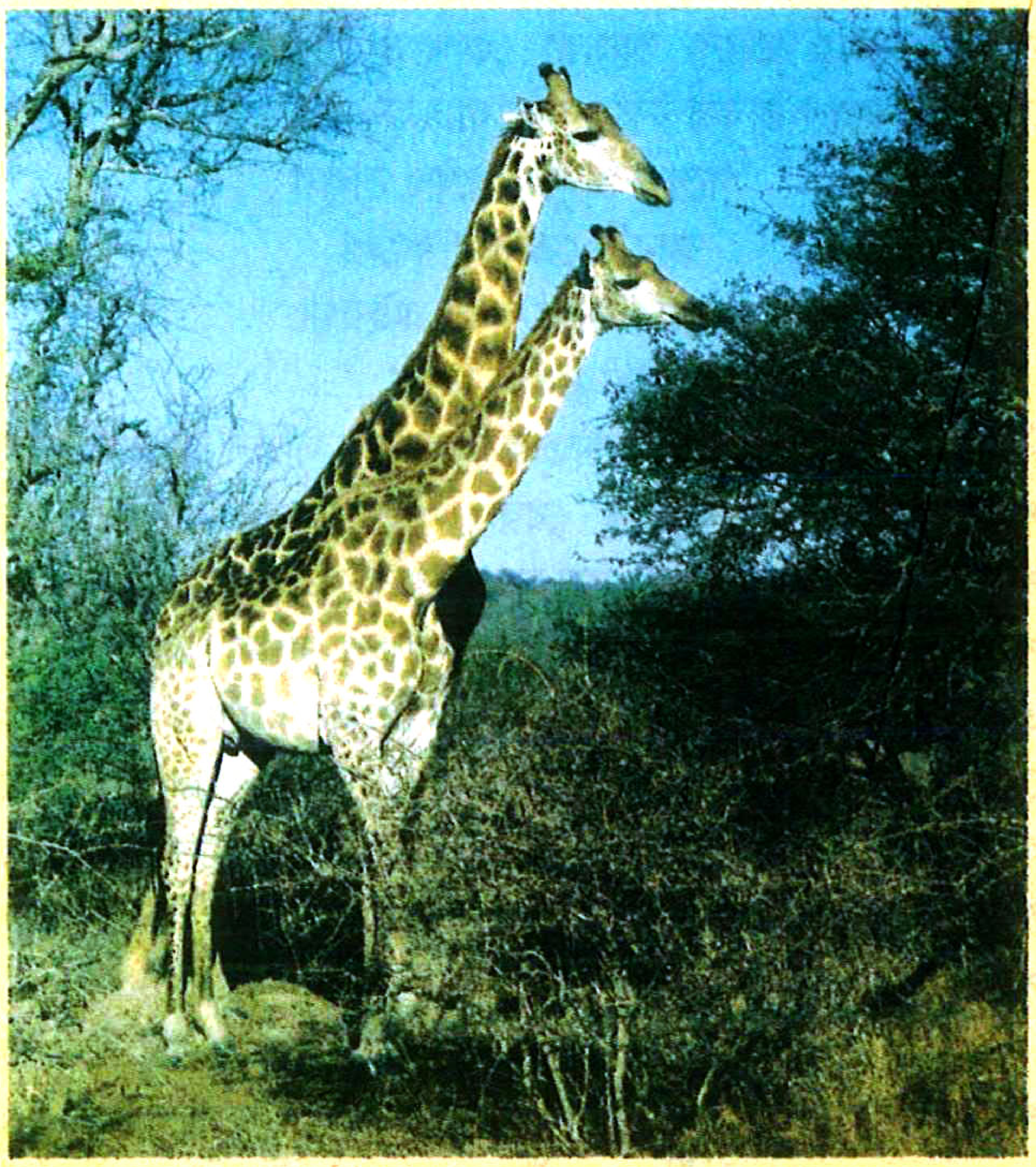
পূর্ব আফ্রিকার সেরেঙ্গিটি তৃণভূমিতে একদিন দুপুরে জেব্রার দলকে যেমন জল খেতে দেখেছি। দূরে বন্য মহিষের পাল।

১ মার্চের 'ছেলেবেলা' থেকে



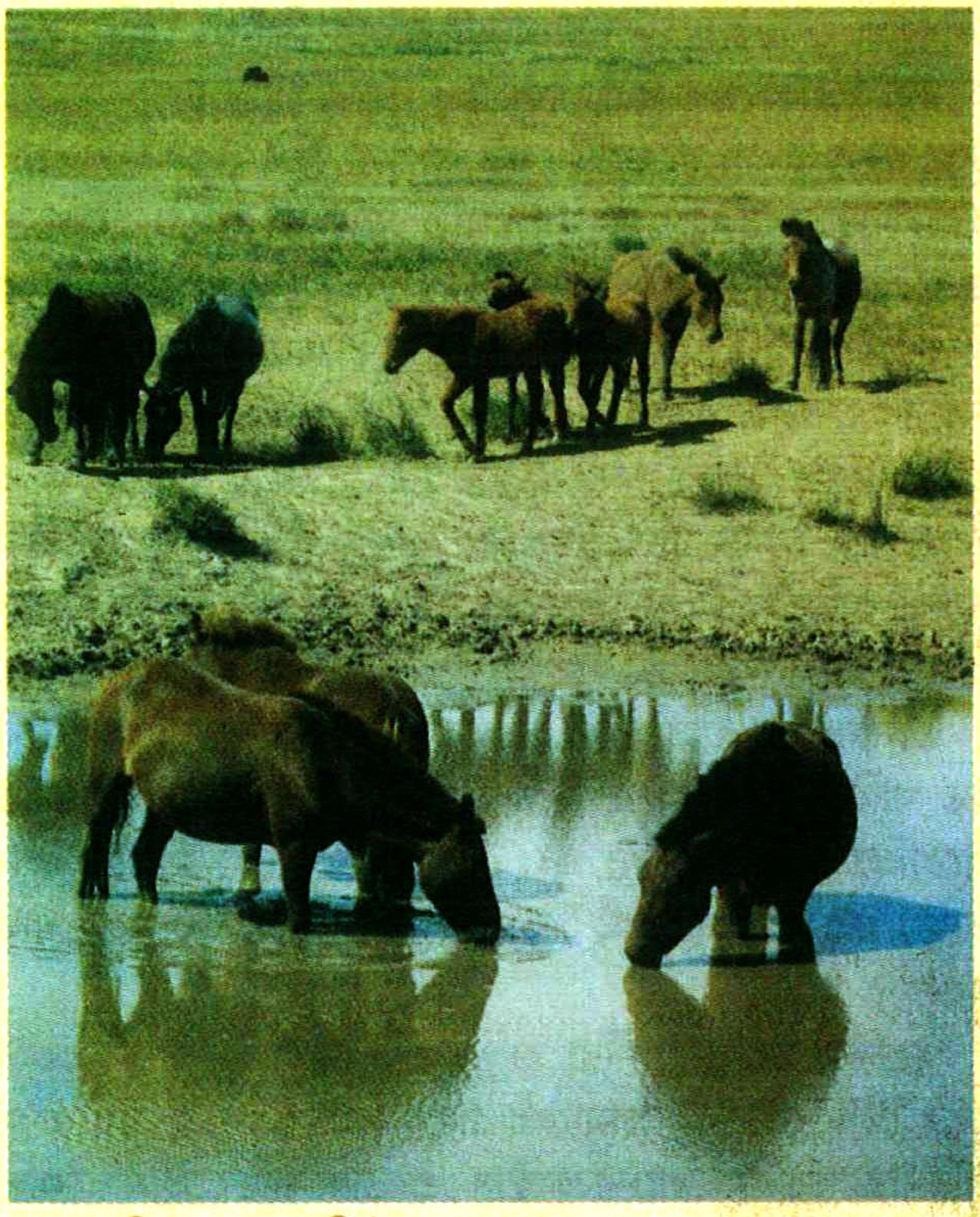
পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়ায় মাসাইমারা বনাঞ্চলে একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল দুজনের সঙ্গে

১৬ ফেব্রুয়ারির 'ছেলেবেলা' থেকে



দক্ষিণ আফ্রিকায় ক্রুগার ন্যাশনাল পার্কে সকাল থেকে ঘুরতে ঘুরতে দুপুরবেলা এই দুই জিরাফকে যেমন দেখলাম।

১৬ মার্চের 'ছেলেবেলা' থেকে



মোঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলানবাতর থেকে দূরে ধুধু প্রান্তরের দিকে যেতে যেতে তাঁবুবাসী যাযাবরদের ঘোড়ার দলকে যেমন জল খেতে দেখেছি।

এমাসের দূরের বন্ধু



পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়ায় তিন সিংহীর মধ্যাহ্নবিশ্রাম। ব্যাঘাত না ঘটিয়ে চুপি চুপি ছবি তুলেছি।

৩০ বছর আগের 'ছেলেবেলা' থেকে

গ্রামের খালে হাঙর

কানাইলাল চক্রবর্তী

আমাদের গ্রামের ছোটখালে একবার একটা হাঙর ধরা পড়েছিল। সে এক হুলুস্থুলু কাণ্ড। হাঙর থাকে সমুদ্রে। যেমন বিরাট চেহারা তেমনই তার তেজ। সিন্ধু ঘোটক-টোটক এক গ্রাসে খেয়ে ফেলে। সেই রকম একটা হাঙর কী করে এসে একটা ছোট খালে ঢুকল, কেউ জানে না।

আমরা তখন ইস্কুলে পড়ি। আমাদের গ্রামের জেলেপাড়ার গা ঘেঁসে ছিল একটা সোতা খাল। জোয়ার এলে ভরে যায়। ভাঁটার সময় হাঁটু জল।

একদিন দুপুরের জোয়ারটা সবে শেষ হয়েছে। একটু পরেই ভাঁটার টান শুরু হবে। নিতাই জেলে তার জাল নিয়ে গিয়ে বসল তার বাড়ির লাগোয়া বাঁকটায়। জোয়ারে অনেক মাছ এসেছে খালে। ভাঁটায় আবার বেরিয়ে যাবে। পূর্ণিমার 'জো'। জাল ফেললে পাবদা, সরল পুঁটি, গলদা চিংড়ি ধরা পড়বেই। নিতাইয়ের পাকা হিসেব। জেলেরা তিথি নক্ষত্র জেনেই মাছ ধরতে নামে।

দুপুরের ভাতঘুমটুকু সেরে পড়শিরাও কেউ কেউ এসে বসেছে নিতাইয়ের পাশে। নিতাই বসে বসে বিড়ি টানছে আর খালের গায়ে জলের দাগ দেখছে।

ভাঁটার টান কখন জোর হয়েছে, কথায় কথায় খেয়াল করেনি কেউ। হঠাৎ জলটা অনেক নীচে নেমে গিয়েছে দেখে নিতাই জালটা তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে দিল খালের অর্ধেকটা জুড়ে। তারপর মুখের বিড়িটায় শেষ টান দিয়ে সেটা ফেলে দিয়েই জাল আবার টানতে শুরু করল। সকলের চোখ এবার জালের দিকে। কিন্তু কী আশ্চর্য! দুই একটা চেলা পুঁটি ছাড়া জাল যে একেবারে ফাঁকা। সকলেই অবাক। এরকম তো হয় না কখনও!

রতিকান্ত হঠাৎ গলা উঁচু করে কী যেন দেখতে পেল একটু দূরে। তার চোখে বিস্ময়। খালের শেষ জলটুকু ওলটপালট করে কী যেন একটা আসছে এদিকে।

নটবর এবার দুই পায়ে খাড়া হয়ে দেখে বলে উঠল, 'জোর বরাত নিতাইদা! আজ এক মাছেই রাজা!'

উৎসাহে লাফিয়ে উঠে তিনকড়ি বলল, একটু আটকাতে পারলেই হল। সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ব খালে। জাল সুদ্ধু জাপটে ধরে তুলে আনব। মাছের জোর তো জলে। শুকনো খালে কতক্ষণ লড়বে ব্যাটা?'

নিতাইয়ের ভুরু ততক্ষণে কুঁচকে গিয়েছে। সে দাঁতে দাঁত চেপে জাল টানছে। এদিকে জালের মধ্যেও তখন দারুণ তোলপাড়।

তিনকড়ি খালের পাড়ে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। চোখ



সরু করে জালের মধ্যেটা দেখবার চেষ্টা করে চিৎকার করে উঠল, 'কুমির, কুমির।'

নিতাই বলল, 'কুমির হোক আর যাই হোক, ওকে পালাতে দেব না। ব্যাটা সব মাছ খেয়ে ফেলেছে, একটা মাছ নেই খালে।'

সঙ্গে সঙ্গে বল্লম, সড়কি, বাঁশ, বাঁখারি যে যা পেল, নিয়ে এসে বেদম মারতে লাগল জন্তুটাকে। কিন্তু কী এটা! কুমির তো নয়!

গোলমাল শুনে প্রাইমারি স্কুলের টিচার বনবিহারীবাবুও হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটে এসেছিলেন। প্রাণীটাকে দেখেই বলে উঠলেন, 'বাপ রেঃ এ যে একটা হাঙর!'

পরে মেপে দেখা গেল লম্বায় হাঙরটা ষোলো ফুট।

বনবিহারীবাবু প্রাইমারি স্কুলের টিচার। গ্রামে পণ্ডিত বলে খ্যাতি আছে। উত্তেজনায় একটা বিড়ি ধরিয়ে বললেন, 'এ আর কী দেখছ? একেকটা হাঙর তিরিশ-চল্লিশ ফুটও হয়। এক কামড়ে এরা অন্য প্রাণীর হাত পা কেটে নিয়ে এক গ্রাসে গিলে ফেলে। হাঙরের তেলও খুব দামী। দামী দামী সব ওষুধ তৈরি হয় এদের তেল থেকে।'

খবরটা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। আমাদের গ্রাম ছাড়া দূর দূর গ্রাম থেকেও দলে দলে লোক আসতে লাগল হাঙরটা দেখতে। আমাদের স্কুলেও পরদিন টিফিনের পরে ছুটি দেওয়া হয়েছিল হাঙর দেখার জন্য।

ছবি: পুলক ঘোষ

৩০ বছর আগের 'ছেলেবেলা' থেকে

ডনের ভূত

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ডন আজকাল দারুণ সাহসী ছেলে। কিন্তু কিছুদিন আগেও যা ভিতুক শিরোমণি ছিল বলার নয়। ভূত এঁকে নিজেই ভয় পেয়ে ছবিটা ছিঁড়ে ফেলত। তবু ভূতের ছবি তার আঁকা চাই। বলতুম, 'ভয় যদি পাবি তাহলে আঁকতে যাস কেন রে?' ডন বলত 'ভূতের ছবি আঁকা যে খুব সোজা, মামা! দেখবে?'

হুঁ, সোজা তো বটেই। দেখতুম, ডন কাগজে একটা গোল্লা আঁকল। তারপর গোল্লার মাঝবরাবর একটা রেখা টেনে নামিয়ে দিল। এবার গোল্লার নীচে আড়াআড়ি একটা রেখা টেনে বলল, 'ভূতের হাত মামা!'

'আঙুল কই?'

ডন গম্ভীর মুখে রেখাটার দুদিকে পাঁচটা করে আঙুল টেনে দিয়ে বলল, 'এই তো!'

'পা কই?'

লম্বালম্বি রেখার শেষ থেকে দুটো পা-ও বেরুতে দেখলুম। ডন এবার হুঁশিয়ার। পায়ের আঙুল আঁকতে ভুলল না। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হয়েছে না মামা?'

'তা তো হয়েছে। কিন্তু চোখ কই? মুখ কই? কানই বা কই?'

ডন বিরক্ত হয়ে বলল, 'আঃ! বড্ড জ্বালাতন কর তুমি। দেখ না কী করি।'

কেন যেন ডন একটু পিছিয়ে দাঁড়াল। তারপর গোল্লার দুধারে দুটো ছোট গোল্লা বসিয়ে দিল। হুঁ, কানই বটে। কিন্তু এবার তার মুখে কাঁচুমাচু ভাব। বললুম, 'কী?' ডন আমার কাছে একটু সরে এসে হাত বাড়িয়ে গোল্লার ভেতর পাশাপাশি দুটো খুদে গোল্লা এঁকেই চোখ বুজে ফেলল। বললুম, 'চোখ বুজলি কেন? মুখ আঁক। নইলে বেচারা কথা বলবে কী করে? খাবে কেমন করে?'

ডন একহাতে আমাকে ছুঁয়ে থেকে ঝটপট গোল্লার ভেতর আধখানা চাঁদের রেখা আঁকল। তারপর খোঁচা খোঁচা কয়েকটা দাঁত। তারপর সটান ঘুরে আমাকে জড়িয়ে ধরে চিক্কুর ছাড়ল, 'ছিঁড়ে ফেলো মামা! ছিঁড়ে ফেলো'।

ভূতের চেহারা সত্যি ভয়ঙ্কর হয়েছে বটে। কিন্তু ওটা তো আসলে কাগুজে ভূত। ওকে ভয় পাওয়ার কী আছে? ডনকে বুঝিয়ে পারতুম না। দিদি বলতেন, 'কক্ষনো যদি আর ওসব ছাইপাশ আঁকিস!' ডনের বাবা বলতেন, 'বরং ভূতের ভয়টাই ওর ভাঙানো দরকার! ওকে মারাত্মক-মারাত্মক ভূতের গল্প শোনালে হয়তো কাজ হবে। বিষে বিষে যেমন বিষক্ষয় হয়।'

ভূতের গল্প শোনাবার ভার আমার ওপর দেওয়া হয়েছিল। রাজ্যের যত সাংঘাতিক ভূতের গল্প শোনাতুম। কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হচ্ছিল। দিনদুপুরে ডন ভূতের ভয় পেত। তাই বলে কিন্তু ভূতের ছবি তার আঁকা চাই। এখন বুঝতে পারি, আসলে ডন ভয় পেতেই ভালোবাসত। ভয় পাওয়ারও দারুণ মজা আছে না?

সেদিন কথায়-কথায় ডনকে জিগ্যেস করলুম, 'হ্যাঁ রে, ভূতের ভয় তোর গেল কী করে বলতো?'

ডন মুখ টিপে হেসে বলল, 'ভূতের সঙ্গে আমার খুব যুদ্ধ হয়ে গেছে যে। আমাকে দেখলেই পালায়।'

'বলিস কী!'

ডন চাপা গলায় বলল, 'কাউকে যেন বোলো না মামা! তিনসত্যি করো!'

'আচ্ছা, আচ্ছা। করলুম।'

ডন এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আচারের বয়োম খালি হয়ে যাচ্ছে বলে মা রোজ বকাবকি করে। সেদিন মাকে নিয়ে বাবা ম্যাটিনি শোয়ে গেল, তুমি যেন কোথায় ছিলে...'

'আপিসে।'

'হ্যাঁ। তো আমি চুপচাপ বসে আছি। হঠাৎ ঘরের ভেতর ঠুং ঠুং করে শব্দ হল। আমি ভাবলুম, ঝুনুদের হুলোটা। এয়ারগান তাক করলুম। তারপর বুঝলে মামা কী হল?'

ডন চোখ বড় করে তাকাল। বললুম, 'কী হল?'

ঢোক গিলে ডন বলল, 'ভেতর থেকে কে বলল, এঁই! গুঁলি কোঁরোনো যেঁন! তুঁমি যাঁর ছঁবি আঁকো, আঁমি সেঁই।'

'তারপর, তারপর?'



ডন হাসল। 'আমি গুলি চালিয়ে দিলুম। ব্যস! বলেই সে হঠাৎ চিক্কুর ছাড়ল, 'ওই এসেছে মামা! ওই দেখ, পাঁচিলে বসে আছে।'

তাকিয়ে দেখি, পাঁচিলে একটা কালো বেড়াল বসে হাই তুলছে। মুখের ভেতরটা ভয়ঙ্কর লাল। বললুম, 'সে কী রে! ও তো একটা বেড়াল। তুই যার ছবি আঁকিস সে তো নয়।'

ডন মুখ তেতো করে বলল, 'ধুস! তুমি বুঝতেই পারলে না। এখন যে আমি ওকে বেড়াল করে আঁকি। তুমি বলতে না ভূতেরা অনেকসময় বেড়াল হয়ে যায়?'

সন্দেহ করে বললুম, 'তুই বেড়াল আঁকতে পারিস বুঝি?'

'পারি না?' ডন ঝটপট কাগজ আর কালারপেনসিল বের করল। 'দেখ না, বেড়াল আঁকা কত সোজা।' এই বলে সে আগের মতোই একটা গোল্লা আঁকল। তার গাঘেঁসে একটা ডিম আঁকল। ডিমের শেষদিকটায় আধখানা চাঁদ।

বললুম, 'হুঁ, পারিস বটে। থাক, থাক। ভূত যখন বেড়াল হতে পারে, তখন বেড়াল আঁকাই ভালো।'

ডন ছবি ফেলে বীরদর্পে এয়ারগান বাগিয়ে দৌড়ুল। কালো বেড়ালটা ছবির বেড়ালই বটে, অর্থাৎ নিছক কাগুজে। নইলে এয়ারগান দেখে লেজ গুটিয়ে পালায়? শুধু একটাই সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। ওই আচারের বয়োম খালি হওয়ার ব্যাপার।...

৩০ বছর আগের 'ছেলেবেলা' থেকে

বিজার ভাগ্য

প্রীতিমান থাপা

প্রীতিমান থাপা একজন বৃদ্ধ নেপালি। চমৎকার বাংলায় মুখে-মুখে গল্প শোনাতে ওস্তাদ। আপাতত আমরা তাঁর মুখ থেকে তোমাদের জন্য এই গল্পটি লিখে এনেছি।

এক পাহাড়ি গ্রামে এক ছোট রাখাল ছেলে বাস করত। তার নাম ছিল বিজা। বড় গরিব ছিল সে। প্রতিদিন সকালে এক পাল গরু নিয়ে মাঠে যেত। সঙ্গে নিয়ে যেত দুখানা মাত্র রুটি। দুপুরে সেইটুকু খেয়ে ঝরনার জলে তেষ্টা মেটাত। তারপর বিকেলের আলো কমে এলে গরু নিয়ে গ্রামে ফেরা। বেশি টাকা রোজগার করতে পারে না বলে বিজার বাবা-মা খুব রাগ করত তার ওপর। বিজার মন দুঃখে ভরে যেত।

এইভাবে দিন কাটছিল। বর্ষা কেটে গিয়ে শরৎ এল। পাহাড়ি জায়গা। তাই বেশ ঠান্ডা। বিজার একটা মাত্র ছেঁড়া কোট। সেটাতে তেমন শীত আটকায় না। তাই যতক্ষণ রোদ থাকত ততক্ষণ সে রোদ্দুরে বসে থাকত। একেক দিন আরামে ঘুম এসে যেত কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবার উপায় তো ছিল না। গরুগুলো যদি দূরে চলে যায় বা কোনও বিষাক্ত লতা খেয়ে ফেলে এইসব ভাবনা ভাবতে হত তাকে। সাবধান হওয়া সত্ত্বেও একদিন কিন্তু এই দোষটাই ঘটে গেল তার। বিকেলের পড়ন্ত রোদে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে। যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখে সর্বনাশ। অন্ধকার হয়ে এসেছে চারধার। গরুগুলো নিজেরাই রাস্তা চিনে গ্রামে চলে গিয়েছে। মাঠে জনমানব নেই। ভারি ভয় হল বিজার। তাড়াতাড়ি গ্রামের দিকে চলল সে। হঠাৎ সেই নির্জন রাস্তায় দেখা গেল একজন সন্ন্যাসী আসছেন। বিজা একটু কাছে আসা মাত্র তাকে দাঁড়াতে বললেন তিনি। তারপর জিগ্যেস করলেন, "তোমার কি কোনও অভাব আছে? কিছু চাও?" বিজা একটু ভেবে বলল যে তারা খুব গরিব। তাই কিছু টাকা-পয়সা যদি পায় তো ভালো হয়। সন্ন্যাসী বললেন, "তোমাকে দেখে আমার মনে হয়েছে যে তুমি খুব সৎ। তাই তোমাকে একটা কথা বলে দিচ্ছি। যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছো সেখান থেকে পঞ্চাশ পা দক্ষিণে গেলে একটা শুকিয়ে যাওয়া কুয়ো আর তার পাশে একটা বড় পাথর দেখতে পাবে। সেই পাথরের নীচে আছে এক ঘড়া সোনার মোহর। কিন্তু মোহর তোলার আগে একটা কাজ করবে তুমি। একটা ছোট্ট সোনার ত্রিশূল মাটিতে পুঁতে চারটে পায়রা বলি দিয়ে পাথরটা পুজো করবে। তারপর মোহর পাওয়ার পরে গরিব-দুঃখীদের কিছু দান ক'রো।" এই কথা বলে সন্ন্যাসী দ্রুত চলে গেলেন।

বিজা ভাবতে লাগল কী করা যায়। সোনার ত্রিশূল কোথায় পাবে? গ্রামে একজন স্যাকরা ছিল। সে সোজা তার কাছে গিয়ে সোনার ত্রিশূল করে দিতে বলল। স্যাকরা তো অবাক। যার



খাওয়া জোটে না তার আবার এ কী খেয়াল। বিজাকে জেরা করে সে সব জেনে নিল। তারপর বলল— পরদিন সন্ধেবেলায় সে ত্রিশূল তৈরি করে রাখবে। বিজা বাড়ি গিয়ে খুব বকুনি খেল দেরি করে ফেরার জন্য। মা-বাবাকে আসল কথাটা ও কিন্তু বলল না। ওর ইচ্ছে মোহর এনে তাদের একেবারে অবাক করে দেবে।

এদিকে সেই স্যাকরা তখুনি ত্রিশূল গড়তে লেগে গেল। তারপর গভীর রাতে ত্রিশূল আর একটা খাঁচায় চারটে পায়রা নিয়ে গরু চরাবার মাঠের পথে শুকিয়ে যাওয়া কুয়োর কাছে গেল। সেখানে দেখে, মস্ত এক পাথর। ত্রিশূল তার পাশে পুঁতে দিয়ে, পায়রা বলি দিয়ে পাথরের পুজো করল সে। তারপর পাথর সরাল। সন্ন্যাসী ঠিকই বলেছিলেন। এক ঘড়া মোহর যেন তারই অপেক্ষায় ছিল। আনন্দে আত্মহারা হয়ে মোহর নিয়ে বাড়ি এল স্যাকরা।

পরদিন সকালে বিজা গরু নিয়ে মাঠে যাওয়ার পথে ভাবল একবার পাথরটা দেখে আসি। সেখানে গিয়ে দেখে, একটা সোনার ত্রিশূল দাঁড়িয়ে আছে, পাথরটা সরান হয়েছে আর তার ওপর পায়রার পালক আর রক্তের দাগ। সব বুঝল বিজা কিন্তু কী আর করবে। চোখের জল মুছতে মুছতে গরুর পালের কাছে ফিরে এল সে। রাখাল ছেলে বিজা রাখালই রয়ে গেল!

ছবি: পুলক ঘোষ

৩০ বছর আগের 'ছেলেবেলা' থেকে

বিদ্যে

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



সিধু ছিল বিখ্যাত চোর। এত সাফ হাত আর নিখুঁত চুরির মাথা সে-তল্লাটে আর কারও ছিল না। সিঁধ কাটা, গরাদ ভাঙা তো তুচ্ছ ব্যাপার, ভালোরকম মন্ত্র-টন্ত্রও জানা ছিল তার। মন্ত্রের জোরে গেরস্থকে ঘুম পাড়িয়ে হাসতে হাসতে চুরি করে আসত। জীবনে একবারও ধরা পড়েনি।

তা হল কি, সেদিন রাতে সিধু ভালোরকম রোজগার করেছে। পটলাপাড়ার নায়েব মশাইয়ের নতুন জামাই এসেছে। সোনার বোতাম, আংটি, চেন, মেয়ের গলার নেকলেস— জিনিস বড় কম নয়। তবে সিধু ছোটলোক নয়। চুরি করে বটে, কিন্তু গেরস্থকে পথে বসায় না। অর্থাৎ চেঁছেচুঁছে সব নিয়ে আসে না। রেখে ঢেকে নেয়। চুরির পরদিনই যাতে গেরস্থকে ভিক্ষেয় বেরতে না হয় সেদিকে তার নজর থাকে। তবু রোজগার বড় মন্দ হয়নি। মনটা খুশি খুশি ছিল তার।

শেষ রাতে একটু চাঁদ উঠেছে। সিধু মৃদুস্বরে একটু সুর ভাঁজতে ভাঁজতে মাঠ পেরিয়ে নিজের গাঁয়ে ঢুকল। তারপর পুকুরে হাত মুখ ধুয়ে বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াল।

চোরের কান খুব সজাগ। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ও তার কাজ করে। সিধু হঠাৎ খুব স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কী একটা জিনিস আঁচ করে নিল। তারপর বড় ঘরের পিছন দিকটায় আগাছার জঙ্গলে খুব নিঃশব্দে গিয়ে সেঁধোল।

তারপরই সিধুর চক্ষু স্থির। স্বপ্নেরও অগোচর দৃশ্যটা দেখে সে হাসবে না কাঁদবে তা ভেবে পেল না।

একটা চোর তার ঘরে সিঁধ কাটছে।

চোর হলেও সিধু শিল্পী মানুষ। প্রথমটায় অবাক ভাবটা কেটে যেতে তার ভীষণ রাগ হয়েছিল। কিন্তু রাগটা বেশিক্ষণ রইল না। শিল্পী মানুষ শিল্প দেখলেই সব ভুলে যায়। কিছুক্ষণ পিছনে দাঁড়িয়ে সে চোরটার কাজকর্ম দেখে খুশিই হল। সিঁধের হাত অতি পরিষ্কার।

সিঁধ কেটে চোরটা নিয়মমাফিক কেলে হাঁড়ি ঢুকিয়ে কেউ জেগে আছে কিনা পরীক্ষা করল। ঘুমপাড়ানি মন্ত্র পড়ল নির্ভুলভাবে। তারপর সেঁধোল।

পিছু পিছু সিধুও ঢুকে পড়ল।

চোরটার হাত যে ভালো তা সিন্দুকের তালা ভাঙার কায়দাতে বুঝে গেল সিধু। আলমারিটা খুলল একটুও শব্দ না করে। বাসনপত্র যেন তার পোষমানা নাড়াচাড়াতেও শব্দ হল না। সিধু আর থাকতে পারল না। বলেই ফেলল, 'শাবাশ!'

চোরটা চমকে উঠে সিধুকে দেখে লজ্জায় জিভ কেটে মাথা হেঁট করে রইল।

সিধু তার পিঠ চাপড়ে বলল, 'লজ্জার কিছু নেই। হাত আছে তোমার। একটু তালিম নিলেই দিব্যি জমিয়ে ফেলবে।'

চোর সিঁধ কাঠি ফেলে সিধুর পায়ে পড়ে বলল, 'শেখাবেন আমাকে?'

সিধু মাথা নেড়ে বলে, 'শেখাব হে শেখাব। এ বিদ্যে তো আর নিজের ছেলেকে শেখানো যায় না। অথচ বিদ্যেটা নষ্টই বা করি কী করে? তোমার মতো লোক পেলে শেখাই।'

বাকি রাতটা আর সিধু ঘুমোল না। চোরটাকে নিয়ে দাওয়ায় বসে খুব মন দিয়ে চুরির কলাকৌশল শেখাতে লাগল। চোরটা ভক্তি গদগদ মুখে শিখতে লাগল।

ছবি: দেবব্রত ঘোষ

ওঝার কেরামতি

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা গাঁয়ে জন্মেছি, বড় হচ্ছি, গাছপালা আমাদের নিত্য সঙ্গী। এরা আমাদের কত সব রোমাঞ্চকর খবর দেয়। পাখির বাসা, বাতাবিলেবু, ডাসা পেয়ারা, কাঁঠাল এবং কাউ গাছ কোনওটাই আমাদের অভিযান থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না। এইসব অভিযান সাধারণত গোপনেই আমরা করে থাকি। মাতির মার বাতাবিলেবুর গাছটি কোনও বছরই আমাদের নজর থেকে রেহাই পায় না। কাছারি বাড়ির মাঠে স্কুল ছুটির পর যে ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়, তাতে রোজ গন্ডাখানেক কচি বাতাবিলেবুর দরকার হয়। সরবরাহকারী মাতির মার গাছটি। আর বিকেল হলেই আমরা আর্তনাদ শুনি, বুড়ি উঠোনে বসে যাবতীয় মহামারির কবলে আমাদের নিক্ষেপ করছে। তার গাছ থেকে বাতাবিলেবু কারা চুরি করে সে যেমন জানে, আমরাও জানি, এই গালাগাল এবং অভিশাপ আমাদের প্রাপ্য। তবে দুই পক্ষই স্বাবলম্বী, কেউ কারও সামনাসামনি হই না। এক পক্ষের ভয়, কি জানি নাম করে বললে, যদি গাছ একেবারেই ফাঁকা করে দেয়। যা-সব মর্কটের উৎপাত। অপর পক্ষের ভয়, গুরুজনদের কানে উঠলে, শাস্তির পরিমাণ নেহাত কম হবে না। ফলে এক পক্ষ খেলে যায়। অপর পক্ষ কেবল বসে বসে শাপশাপান্ত করে।



সেই মাতির মার বাতাবিলেবু গাছটিও শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেয়েছিল সুদাম কাকার প্রভাবে। জানি না, কেন সুদাম কাকা একরাতে যখন কেরোসিন তেল পাওয়া গেল না— কারণ তখন যুদ্ধ চলছে, সুদাম কাকা বললেন, বুঝলি অনাথ!

অনাথ আমার বড়দার নাম।

বুঝলি, তোদের কাছারি বাড়ির মাঠটা ভালো না।

কেন সুদাম কাকা?

তোরা কি কেউ গায়ের জামা ফেলে এয়েছিস!

না তো!

কিন্তু দেখলাম, একটা গাছে যেন জামা ঝুলছে।

গাছে জামা ঝুলতেই পারে। কারণ স্কুল ছুটি হয়ে গেলে, আমাদের দু-দিকের গোলপোস্ট, শ্লেট বই স্তূপীকৃত করে। নিশানা অব্যর্থ করার জন্য তার ওপর জামা রেখে পোস্ট উঁচু করা হয়। কেউ কেউ, কাঠির মাথায় জামা ঝুলিয়ে দেয়। খেলা শেষে কে আগে বাড়ি পৌঁছবে তার প্রতিযোগিতা— কারণ মাঠের পাশটায় যে জঙ্গল এবং ছোট্ট বনের মতো আছে সেটা পার হলেই একটা ছাড়াবাড়ি। বাড়িঘর নেই। শুধু ঢিবি। এখন সেখানটায় গায়ের ছোটদের কবর দেওয়া হয়। আমাদের গাঁয়ে টোকাই ভূতের বড় ভয়। টোকাইতে ধরলে শিশু নাকি নীল হয়ে যায়। বিকট চিৎকার করে। হাত পা খিঁচতে থাকে। বড় ভয়ানক উৎপাত এই টোকাই ভূতের। সুদাম কাকা তখন রুদ্রাক্ষের মালা পরে মটকিলা গাছের শেকড় এবং বেতের আঁকষি নিয়ে হাজির হবে। এসব কথা বলছি এ-জন্য, একজন ওঝা মানুষ যদি বিদঘুটে খবর দিয়ে বলে, তা হলে তোরা জামাটা ফেলে আসিসনি! ভালো কথা নয়— আমাদের ভয় ধরেই যেতে পারে।

বড়দা আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, তুই ফেলে আসিসনি তো?

আমাকে বড়দারা খেলায় নেয় না। আমার কাজ মাঠের বাইরে। কখনও লাইন্সম্যান। কখনও জামা বইপত্রের জিম্মাদার। আর সেটা না থাকলে মাঠের পাশটায় বড় চুকৈর গাছটার ডালে বসে খেলা দেখা। আমাদের মতো ছোটরা তখন বাতাবিলেবু পেটায় না ঠিক, তবে বসেও থাকে না। মাস্টারমশাইরা বাড়ি চলে যান। পণ্ডিতমশাইয়ের বাজখাই

গলা পাওয়া যায় না। ছুটির পরে স্কুল এবং স্কুলের মাঠ আমাদের জমিদারি। সাঁজ লাগার আগে জমিদারি ফেলে আমরা আসি না। গাছের মগডালে আমার জামাটি ঝুলে থাকতেই পারে। কিন্তু সেদিন আমি লাইন্সম্যান। আমার পক্ষে এতবড় অদায়িত্বশীল কর্ম সম্ভব নয়। বলেছিলাম, না।

পরে খোঁজখবর নিয়েও জামাটির কোনও হদিস পাওয়া যায়নি।

সুদাম কাকা বলেছিলেন, বুঝেছি।

কী বুঝলেন, তিনিই জানেন। নীচে তিনি বসে থাকেন। আমরা তক্তপোষে আলো নিয়ে পড়ি। কেরোসিন তেল নেই বলে আজ আলোও নেই। অন্ধকারে 'বুঝেছি' কথাটা কী ভয়াবহ এবং মারাত্মক সেই প্রথম টের পেয়েছিলাম।

সুদাম কাকা বললেন, তেনারই কাজ।

কী কাজ!

এই আর কি। জামাখান গায় দিয়ে চলে গেলেন।

আপনি দেখেছেন?

না দেখলে ছুটে যাব কেন। তোরা যা বাঁদর, তোদের জামাটামা পড়ে আছে বলেই তো ছুটে যাওয়া।

তারপর?

অ মা দেখি, কেউ জামাটা মগডাল থেকে পেড়ে গায়ে দিচ্ছে!

দেখতে কেমন?

জ্যোৎস্নায় ছায়া হয়ে আছে। বোঝা যায় না।

কোথায় গেল?

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর বাতাবিলেবু গাছটার নীচে অদৃশ্য।

অন্ধকার ঘরে আমরা পাঁচ ভাই। শুনে কেমন আমাদের গা ফুলে উঠতে থাকল। তবু কৌতূহল তীব্র। প্রশ্ন , কে সে জানেন?

কে আবার, নগেন হালুই, গাছটা তো নগেন হালুইয়ের বুক থেকে গজিয়ে উঠেছে। নগেন হালুইকে আমরা জানি। মাতঙ্গিনী পিসির বাবা। মাতঙ্গিনী ছোট আকার নিয়ে মাতি হয়েছে। অর্থাৎ মাতির মার স্বামীর কবরে বাতাবিলেবুর গাছ। তাঁর পাঁজর থেকে গাছটার জন্ম। তাই এত ফলে। ডালপালা একেবারে ঢেকে যায়। অস্বাভাবিক বাড়ন্ত আর ফলন্ত গাছ।

বড়দা বলল, কবর কেন?

মহাসারিতে গেছে। মার দয়া। তোরা তখন হসনি। শরীর খসে গেছিল। তোমার ঠাকুরদার বিধান, মাংস খসে গেলে



পোড়ানো হয় না। মাটি চাপা দিতে হয়।

আমাদের লেবু চুরির নির্ঘন্ট ছিল, রাত আটটা গতে চৌর্যবৃত্তি। তখন এ অঞ্চলটা অন্ধকারে বড় নিশুতি হয়ে থাকে। সুতরাং এই খবর পাওয়ার পর নির্ঘন্ট মেনে চলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। গাছটা থেকে আর কখনও বাতাবিলেব চুরি হয়েছে বলেও শোনা যায়নি।

ছবি: পুলক ঘোষ

যাই সেখানে মাটির পঙ্খিরাজে

রত্নেশ্বর হাজরা

যদি পাই হঠাৎ করে একটুখানি ছুটি
তাহলে খুব— খু-উ-ব সকালে উঠে
একছুটে যাই ছুটে
সেই যেখানে উঠোনে শিস দিচ্ছে দোয়েল
দূর্বাঘাসে হাওয়ার লুটোপুটি।
রোদ তখনো নদীর অন্য পাড়ে
দাঁড়িয়ে আছে খেয়ার অপেক্ষায়
আবছা অন্ধকারের বাদাম দিয়ে
একটা দুটো গয়নার নাও যায়।

যাই সেখানে সেই যেখানে নবান্নে অঘ্রাণে
টিনের চালে ডাকছে দণ্ডকাক
উঠোনে দুই তিন শালিকের এক্কা দোক্কা খেলা
ঠাম্মারা দেয় গোবর-ছড়া ভোর না হতেই রোজ
সেই যেখানে শীত বিহানে
রোদ পোহাত আমার ছেলেবেলা—

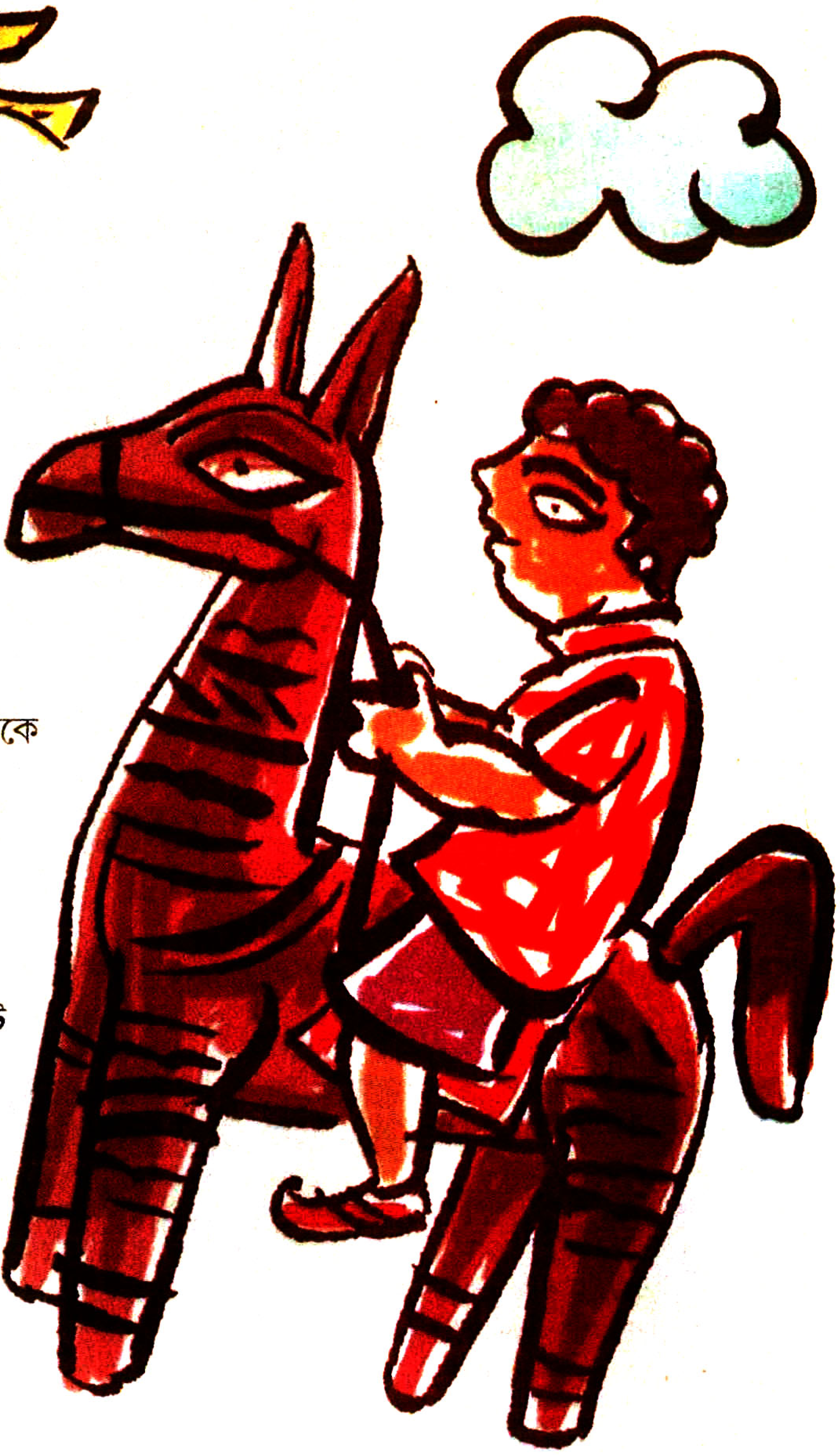
যদি পাই হঠাৎ করে একটুখানি ছুটি
একছুটে যাই সাতসকালে দেখে আসতে মাঠের আলে
আছে কি নেই সেই কবেকার হিজল চারা দুটি।
মাঠ পেরলেই গাঙের ধার
ঝোপে ডাকছে কুবো
হয়তো একটা কালো বেড়াল ডিঙিয়ে যাবে পথ
মানব না অশুভ—
দেখব নদী কেমন আছে— জল চলেছে কোথায় বাঁকে বাঁকে
মাঝির সারি গানে
পালে অল্প হাওয়ার গল্প
নাও চলেছে হাল্কা ভাটির টানে—

যাই সেখানে সেই যেখানে সন্ধেবেলায় উঠে
বঁইচিবনে জোনাকপোকার ছাওয়ালগুলো দুরন্ত আকখুটে
দীপ জ্বালিয়ে আলোছায়ার দেখায় আজও খেলা
পাততাড়িতে ভীষণ অবহেলা—

যদি পাই হঠাৎ করে একটুখানি ছুটি
ভুলে যাই মায়ের বারণ— বাবার শাসন
দাদাদের ভিরকুটি—
বাদলা মেঘের পিঠে চড়ে যাই— চলে যাই
বৃষ্টির গান শুনতে টিনের চালে
সঙ্গে ঠামা'র পরনকথার জমজমাটি আষাঢ় সন্ধ্যাকালে—

মুলিবাঁশের বেড়ার ফাঁকে ঢুকছে জোলো হাওয়া
চোখের পাতায় আসন পাতে ঘুমের পরি এসে
উথালপাথাল ক্ষীরসমুদ্দুর— ঘরের মধ্যে ঘুমপাড়ানি গাওয়া।
ভাম ডাকছে, ফেউ ডাকছে— প্রায় ঘুমন্ত আমি
এক হাতে লাল মাটির ঘোড়া আর হাতে কম দামি
যেন একটা নতুন জামা। বাজের শব্দে
চম্‌কে ওঠা একটু মাঝে মাঝে—
আমি-ই যেন পৌঁছে গেছি সেই কবেকার ছেলেবেলায়
মাটির পঙ্খিরাজে—





ছবি: শান্তনু দে



বাঘের বাচ্চা

মৈত্রেয়ী নাগ



বন পেরিয়ে পাহাড় ঘেঁষা
পথ গিয়েছে দূরে
কাছাকাছি কোন এক গ্রামের
বাঁ পাশ দিয়ে ঘুরে
মাঝে মাঝে এ সব গ্রামে
পড়শি শেয়াল আসে
পালের ভেড়া চুরি করে
খ্যাকখেঁকিয়ে হাসে

ও সব কথা থাক
ভেড়ার পালের মধ্যে ছিল
একটা বাচ্চা বাঘ

কেমন করে গ্রামে এল
তা বলা নয় সোজা
সকাল বেলা রাখাল দেখে
বাঘের দু-চোখ বোজা

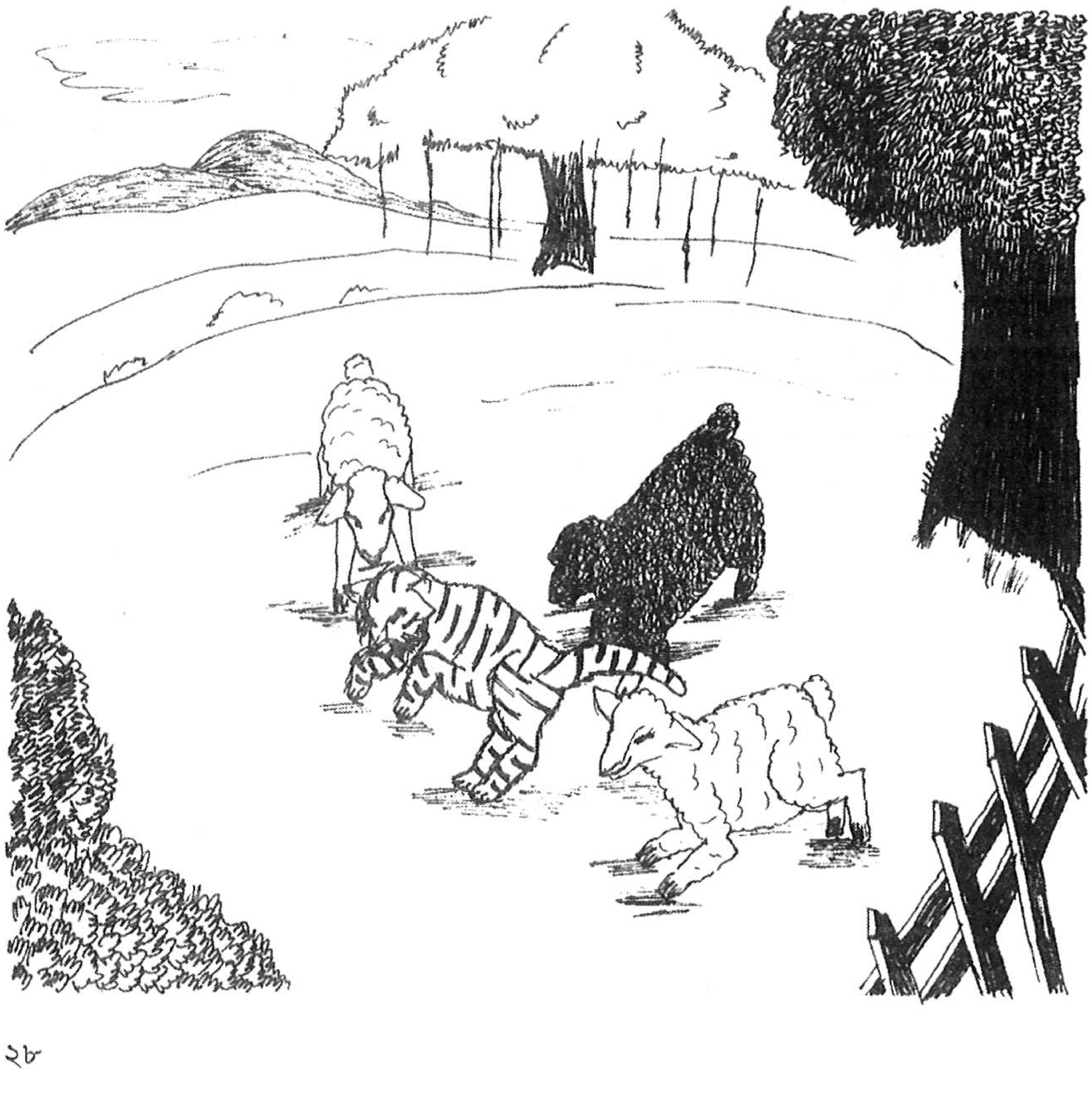


হয়তো কোন বাচ্চা ছেলে
খেলার সাথী ভেবে

ওকে ধরে এনেছে, সে
ফেরৎ কেন দেবে?

কিম্বা বাঘের ছানা-ই
দিয়ে মায়ের চোখে ধুলো

খেলতে খেলতে পথ হারিয়ে
পথের ধারেই শুলো



ভেড়ামাকেই মা ভাবে সে
ভেড়াদাদাই দাদা
সকাল বিকেল সবার সঙ্গে
মাখে সমান কাদা

একটাই তার দুঃখ
সবার গায়ে পরা কেমন
লোমশ জামা সূক্ষ্ম

সবাই কেমন গলা ছেড়ে
ভ্যা-ভ্যা সুরে ডাকে
ওর স্বরটাই বিশ্রী শোনায়,
মানায় না ওই ঝাঁকে

নিজের দিকে চাইলেই তার ভীষণ হত রাগ
সারা গায়ে বড্ড বেশি
ডোরাকাটা দাগ!

সত্যি বলতে, ওকে নিয়ে
হাসাহাসিই হত
পায়ে জুতো নেই, গায়ে জামা নেই,
অন্য সবার মতো

'কান দুটো দেখ, হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা'
'লেজখানা দেখ, হা হা'
মা ভেড়াটা নরম সুরে
করত আহা আহা



কিন্তু ওদের সবার মধ্যে
ভালোবাসাও ছিল
ওকে বেশি খেতে দেওয়ায়
হত মতের মিলও

একদিন এক সন্ধেবেলা—
তরুণ তখন বাঘ
দেখল সবাই হঠাৎই তার
রাজকীয় রাগ

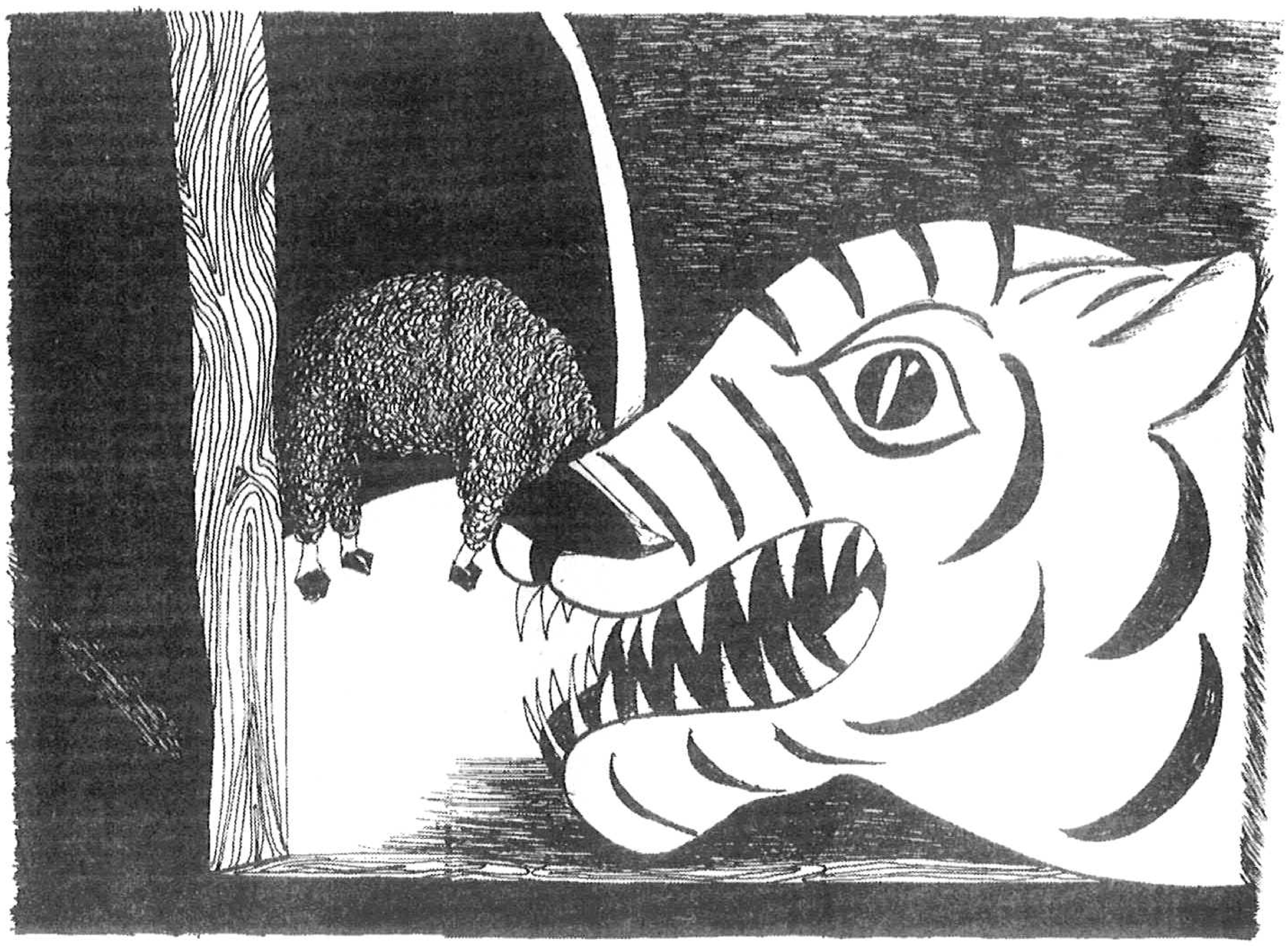
খামার বাড়ির পেছন দিকে
মস্ত ছিল দেয়াল
তারই গায়ে ঘাপটি মেরে
লুকিয়ে ছিল শেয়াল



খাবার পালা চুকিয়ে দিয়ে
সবাই যখন শোবে
কেই-বা জানত চোরটা আগে
বাঘের মাকেই ছোঁবে

কাণ্ড দেখে ভেড়ারা সব
ভয়েই দিশেহারা
ঘরের মধ্যে 'মা, মা' বলে
কাঁদছে বাঘ বেচারা

বাঘের গলা শুনেই কিন্তু
শেয়াল গেছে চমকে
ভেড়াগুলোর মতন সেও
দাঁড়িয়ে গেল থমকে



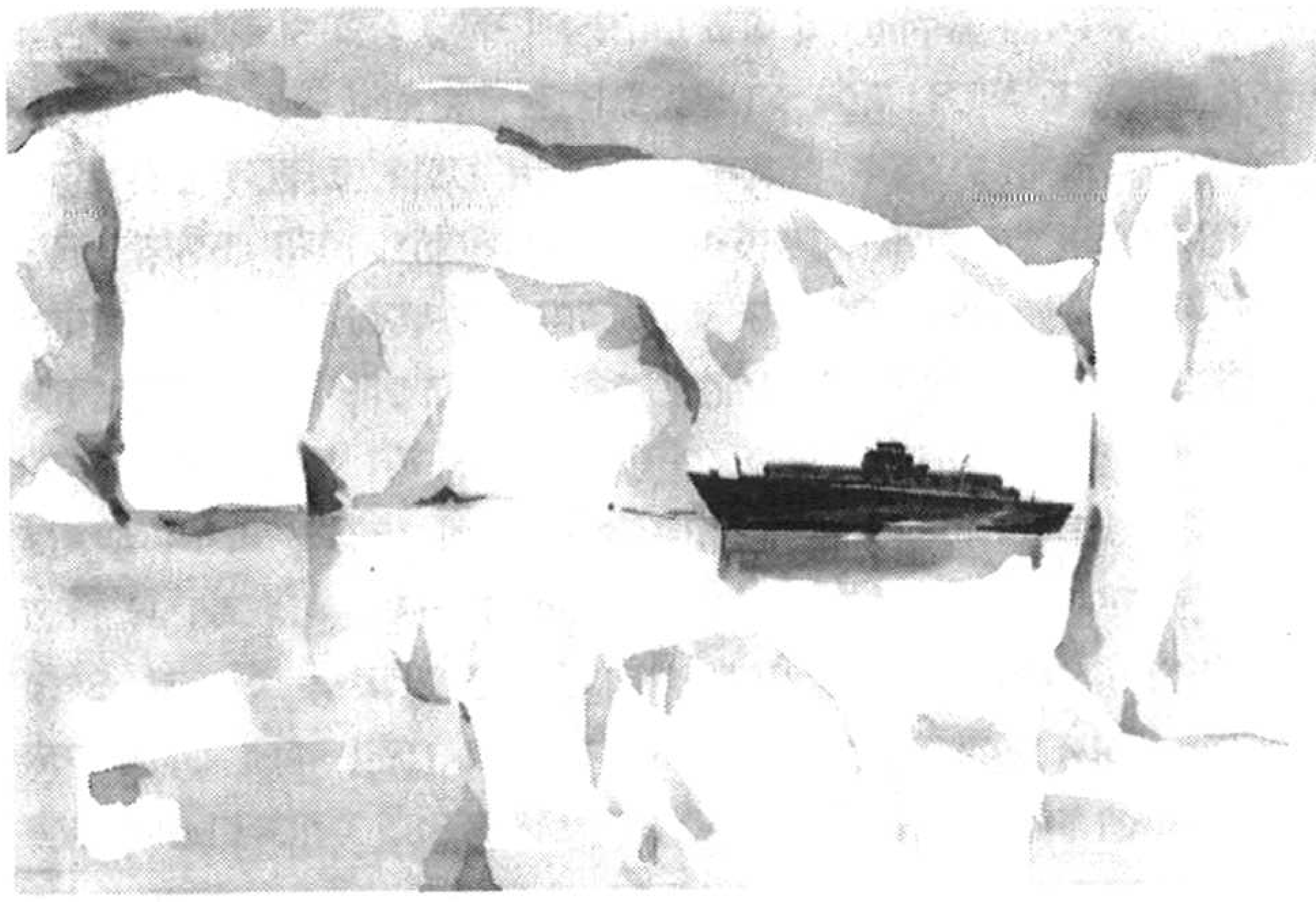
সুযোগ বুঝে মা ভেড়াটা
এক ঝটকায় উঠে
ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল
জোর কদমে ছুটে

হালুম বলে বাঘটি শুধু
মুখখানি তার বাড়ায়
শেয়াল তখন হাওয়া—
পাগল? বাঘের সামনে দাঁড়ায়!

সেদিন থেকেই এই গ্রামে আর
শেয়াল টেয়াল আসছে না।
আর হ্যাঁ, এখন বাঘকে দেখেও
মোটেই কেউ আর হাসছে না।



ছবি: হিরণ্ময়ী



বরফের বাগান

(পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত)

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

জাহাজ ছাড়বার কথা পাঁচটায়, সন্ধে সাতটা বেজে গেল, জাহাজের ভোঁ আর বাজে না। অনেকক্ষণ থেকে মাইকে ক্যাপ্টেনের একই ঘোষণা শোনা যাচ্ছে— একজন যাত্রী এখনও এসে পৌঁছতে পারেননি, তিনি আসছেন বহু দূরের দেশ থেকে, ঝড়জলে তাঁর বিমান আফ্রিকার কোনও বন্দরে নেমে পড়তে বাধ্য হয়েছিল, তিনি বারবার বার্তা পাঠাচ্ছেন, তাঁর আন্তরিক অনুরোধ, তাঁকে ফেলে জাহাজ যেন ছেড়ে না দেয়। তাঁর দেরির জন্য যদি জাহাজ কোম্পানির কোনও ক্ষতি হয় তা তিনি পুষিয়ে দেবেন।

রাত পৌনে-আটটায় আবার ক্যাপ্টেনের গলা— সেই যাত্রীর বিমান বুয়েনস আইরেস ছেড়ে এসেছে, যে-কোনও সময় উশুয়াইয়া বিমানবন্দরে নামবে। আশা করা যায় আর এক ঘণ্টার মধ্যে তিনি নিশ্চিতই জাহাজে উঠবেন। তিনি ওঠামাত্র জাহাজ রওনা হবে।

আমাদের জাহাজের নাম পোলিয়ার্নে অরলোভা। জাহাজে চারটে ডেক। লোয়ার ডেক, মেইন ডেক, আপার ডেক আর ক্যাপ্টেন্স ডেক। পাঁচতলায় ব্রিজ।

জাহাজ ছাড়ল রাত ঠিক নটা বারো মিনিটে। আমি পাঁচতলার ব্রিজ থেকে উশুয়াইয়ার তীরভূমির ছবি তোলায় এতটাই মগ্ন ছিলাম যে আচমকা জাহাজের ভোঁ শুনে ঝাঁকুনি খেয়ে গেলাম। ক্যামেরাসুদ্ধু হাত নড়ে গিয়ে শটটাই নষ্ট হয়ে গেল।

রাত প্রায় সওয়া নটাতেও আন্দিজ পাহাড়শ্রেণীর মাথায়, তার ওপরের আকাশে সূর্যাস্তের গাঢ় কমলা রং লেগে আছে। স্থির হয়ে বাকি দুটো ভোঁ শুনতে শুনতে উশুয়াইয়ার রাঙা আকাশের নীচে তীরভূমির সদ্য আলো-জ্বলা ঘরবাড়ি, রাস্তার ছবি তুলতে তুলতে বিগল চ্যানেল ধরে ক্রমশ পুবদিকে এগিয়ে চললাম। আলোকিত তীরভূমিও ছোট হতে হতে তুলির একটা টানের মতো সরু দেখাল। একসময়ে মানুষের ঘরবাড়ির সেই শেষ রেখাটাও মুছে গেল।

দিনদুয়েক একটানা চলার পরই আমাদের জাহাজ বরফে ঢাকা সমুদ্রে পড়বে। তাতে অবশ্য ভয়ের কিছু নেই। ১৯৭১ সালে রাশিয়ায় তৈরি এ জাহাজ সমুদ্রের বরফ কাটতে কাটতে এগোতে পারে।

আমরা চলেছি আন্টার্কটিকায়। জমাট বরফের মহাদেশ দেখবার টানে এই শখের অভিযাত্রীদলে নানা দেশের মানুষ একসঙ্গে এসে মিলেছেন। এরকম যাত্রী বা অভিযাত্রী ৬৬ জন, তাছাড়া জাহাজের ক্যাপ্টেন, নাবিক, কুক, রেডিও অফিসার, পরিচারক-পরিচারিকা ইত্যাদি ৬০ জন, এছাড়াও অভিযান পরিচালনার জন্য আরও ১৬ জন বিশেষজ্ঞ ধরে মোট লোকসংখ্যা ১৩২।

জাহাজ ক্রমশ দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে।

আমি আলাস্কা থেকে দেশে ফিরে এবার চলেছি আন্টার্কটিকায়। সেই একই চ্যানেলের জন্য ভিডিও ছবি তুলতে— এবার আন্টার্কটিকা ভ্রমণের তথ্যচিত্র। ভ্রমণ না বলে অভিযান বললেই কথাটা বেশি ঠিক হয়।

আলাস্কা থেকে কখনও জীবিত অবস্থায় ফিরে আসব, আবার আন্টার্কটিকার পথে পাড়ি দেব— কিছুদিন আগেও এ ছিল আমার স্বপ্নের অতীত। আলাস্কার উত্তরতম অঞ্চলে চারদিকে কুড়ি-পঁচিশ ফুট গভীর বরফের রাজ্যে, প্রবল তুষারপাতে পুরো শীতকালটা কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত কী করে দেশে ফিরেছি মনে পড়লে নিজেই অবাক হয়ে যাই। হাতে-পায়ে তুষারক্ষত নিয়েও মোট পনেরোটা এক্সপোজড ক্যাসেট অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পেরেছি, সেটাই আনন্দের। কেননা আমার সেই অসম্পূর্ণ 'আলাস্কা' টিভির দর্শকদের ভালো লেগেছে, শুনলাম ছ-মাসের মধ্যে ওই চ্যানেলে মোট পাঁচবার ছবিটা দেখানো হয়েছে। আমি জানি, ছবিটা খুবই দুর্বল। একা হাতে, বেশিরভাগই ট্রাইপড ছাড়া, ছবি তোলা যায় নাকি? তবু টিভি-দর্শকদের ভালো লাগছে, তার কারণ ঘরে বসে তারা ওই দূর দুর্গম অঞ্চল একেবারে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে।

আন্টার্কটিকায় কতটা কী করতে পারব জানি না। আন্টার্কটিকা অনেক বেশি দুর্গম, অনেক বেশি কঠিন। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু, সবচেয়ে শীতল, সবচেয়ে শুষ্ক, সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন, সবচেয়ে প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার এই মহাদেশের শতকরা আটানব্বই ভাগই কঠিন বরফে ঢাকা।

জনবসতিহীন এমন ভয়ানক ঠান্ডা আর প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে গ্লেসিয়ার, আইসবার্গ আর সীমাহীন তুষারভূমির সাম্রাজ্যে আমি একা একটামাত্র ছোট ক্যামেরা নিয়ে টিভির জন্য ছবি তুলতে কেনই বা রাজি হলাম ভেবে মাঝে মাঝে বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে আসে! তবে একাজে রাজি না হলে আন্টার্কটিকা আসবার টাকাই বা আমাকে কে দিত!

টাকার ব্যবস্থা চ্যানেলের জন্য সম্ভব হলেও আমার দুর্গম আন্টার্কটিকা অভিযানের স্বপ্ন সত্যি হবার মূলে কিন্তু নিউজিল্যান্ডবাসী বিশেষজ্ঞ অভিযাত্রী হোয়েলার স্কট। ইন্টারনেটে দক্ষিণমেরু অভিযানের একটা ওয়েবসাইটে আমি তাঁর মেরু অভিযানের বিস্ময়কর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার কথা পড়ে তাঁর সঙ্গে ই-মেলেই যোগাযোগ করি। তিনি সবরকম তথ্য দিয়ে আমাকে সাহায্য না করলে আমি এই দুর্লভ অভিযানের হদিশই পেতাম না। কবে কোথা থেকে অভিযান শুরু হবে, কতদিন ধরে তা চলবে, কতটা বিপদসঙ্কুল, আমি এতে অংশ নিতে পারি কিনা, কত খরচ ইত্যাদি সবই তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন।

আমাদের এই আন্টার্কটিকা অভিযানের নেতা হোয়েলার স্কট। তিনিই সেই বিখ্যাত দক্ষিণমেরু-অভিযাত্রী রবার্ট ফ্যালকন স্কটের বংশধর কিনা এখনও জিজ্ঞাসা করা হয়নি। এমনিতে আন্টার্কটিকা অভিযান সম্পর্কে আমার কোনও জ্ঞান বা এই অভিযানের ইতিহাস বিষয়ে কোনও ধারণাই নেই, তবে এপথের ঐতিহাসিক অভিযাত্রী শ্যাকলটন-স্কট-আমুন্ডসেনের কথা আমি স্কুলে থাকতেই পড়েছি।

দুঃসাহসিক, অভিজ্ঞ, মধ্যবয়সি হোয়েলার একইসঙ্গে উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরু অভিযান করেছেন। একদিকে যেমন উত্তরমেরু ছুঁয়ে ফেরার পথে স্ভালবার্দ, স্পিৎসবারজেন আর লঙ্গারবিয়েনের বরফরাজ্যে শ্বেত ভালুকদের বিচরণক্ষেত্রে তিনি তেরোদিন কাটিয়েছেন, আরেকদিকে আবার দক্ষিণমেরু বিন্দুর তিনশো মাইলের মধ্যে তুষারক্ষেত্রে মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত তিনি একেবারে একা বাস করে এসেছেন। আমাদের যেমন শীত শেষ হয়ে মার্চ-এপ্রিল মাসে বসন্ত শুরু হয়, তারপরই আসে গ্রীষ্মকাল, আন্টার্কটিকায় তার উল্টো, মার্চ-এপ্রিলে গ্রীষ্ম শেষ হয়ে শুরু হয় শীত। আকাশে তখন সূর্য বলে কিছু নেই, সমুদ্রও জমে বরফ। সমগ্র দক্ষিণমেরু

অঞ্চলই তখন জমাট বরফ। সেইসময় হোয়েলার সেখানে তিন মাস ছিলেন!

আমরা আন্টার্কটিকায় যাচ্ছি নভেম্বরের মাঝামাঝি। আর্জেন্টিনার বন্দর-শহর উশুয়াইয়া থেকে জাহাজ রওনা হল উনিশে নভেম্বর। ছ-সপ্তাহ আন্টার্কটিকা ঘুরে, দক্ষিণমেরুবৃত্তের যতটা সম্ভব ভেতরে গিয়ে আবার পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষিণের শহর এই উশুয়াইয়ায় ফিরে আসব এমনই কথা আছে।

তবে কেউ সাংঘাতিক অসুস্থ হলে, জরুরি চিকিৎসার জন্যও তাকে উশুয়াইয়ায় ফিরিয়ে আনা যাবে না। কারও মৃত্যু হলে তার শবদেহও দেশে ফেরাবার ব্যবস্থা নেই। চুক্তিপত্রে এরকম আরও কয়েকটি ভয়-পাওয়ানো শর্ত দেখেও অভিযান শুরুর বহু আগেই সব যাত্রীকে সম্মতি জানিয়ে ছাপানো ফর্মে সই করে দিতে হয়েছিল।

২

জল শুধু জল। আমাদের জাহাজ ক্রমশ আদি-অন্তহীন মহাসমুদ্রে এগিয়ে চলল।

এই জাহাজ আর জাহাজের সঙ্গে উড়ে চলা অ্যালবাট্রস আর পেট্রেল পাখির ঝাঁক ছাড়া কোথাও কিছু নেই। সমুদ্রও দেখতে দেখতে নীলবর্ণ ছেড়ে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল। জাহাজের মাইকে অভিযানের নেতা হোয়েলার স্কটের ঘোষণা শোনা গেল— আমরা এখন চল্লিশ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ পার হয়ে যাচ্ছি।

দ্বিতীয় দিন মাঝরাতে সমুদ্র ফুলে উঠল। তবে কি সমুদ্রের তলায় ভূমিকম্প হচ্ছে? আলমারি ও টেবিলের সবকটা ড্রয়ার মেঝেতে ছিটকে পড়ে এপাশ-ওপাশ গড়াগড়ি খাচ্ছে। জাহাজ একবার একাত, একবার ওকাত। প্রচণ্ড দুলছে। আচমকা আশঙ্কায় জেগে উঠে জাহাজের একদিকের জানলা দিয়ে দেখি একবার জাহাজ কাৎ হয়ে ঢেউয়ের ওপর প্রায় শুয়ে পড়ছে, আরেকবার সোজা আকাশে। একবার আমার চোখ সমুদ্রের উন্মত্ত ঢেউ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, পরের মুহূর্তেই দেখছি গোধূলির মতো আলোময় আকাশে সাদা মেঘের পাল। তার মধ্যে আবার একেকবার একদিকেই এত বেশিক্ষণ কাত হয়ে থাকছে যে ভয়ে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। মনে আতঙ্ক, জাহাজ এই বুঝি উল্টে গেল!

এপথের কুখ্যাত ড্রেক প্যাসেজে পড়িনি তো? তাহলে তো ড্রেক প্যাসেজের ভয়াবহ রূপ ক্যাসেটবন্দি করার সুযোগ বিনা চেষ্টায় ছেড়ে দেওয়া যায় না! এক হাতে শক্ত করে ক্যামেরা ধরে, কখনও দেওয়াল ঘেঁসটে এক পা এক পা করে এগিয়ে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেভিগেশন রুমের মাথায় ব্রিজে পৌঁছে আতঙ্কে মন অসাড় হয়ে যায়। জাহাজের জানলা দিয়ে দেখেছিলাম পাশাপাশি দুলুনি, এখন দেখছি একেবারে সামনেই জাহাজের মুখটা একেকবার যেন হাই জাম্প দিয়ে ঢেউ ছেড়ে সোজা আকাশে উঠে গিয়ে পরের মুহূর্তেই জলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। যতই রেলিং ঠেসে দাঁড়াবার চেষ্টা করি কেউ যেন আমাকে ধাক্কা দিয়ে ছুড়ে ফেলতে চাইছে। তার মধ্যেই ক্যামেরা চালু করে শক্ত হাতে ধরে আছি। প্রবল হাওয়া আর সাংঘাতিক ঢেউয়ের সঙ্গে এ এক অসম লড়াই। যে-কোনও সময় হয়তো আমাকে উড়িয়ে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেবে, তবু এমন কল্পনাতীত সব দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করার উত্তেজনায় আমি যেন পাগল হয়ে গেছি!

মাইকে প্রথমে ক্যাপ্টেনের তারপর হোয়েলারের সতর্কবাণী শোনা গেল— আমরা ভয়াবহ ড্রেক প্যাসেজে পড়েছি। গতকালই যেমন সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল সেইমতো আশা করি সবাই টেবিল ও আলমারির সব ড্রয়ার খুলে এক জায়গায় জড়ো করে রেখেছেন। কেউ বিছানা ছেড়ে উঠবেন না, কেউ দাঁড়াবেন না।

হায়, ছবি তোলায় মগ্ন থাকায় কাল আমি এই সতর্কবার্তা শুনিনি।

ক্যাপ্টেন ঘণ্টাখানেক পরে আবার জানালেন, আমরা চেষ্টা করছি ড্রেক প্যাসেজের প্রবল হাওয়া যাতে আমাদের জাহাজকে ধাক্কা দিয়ে উল্টে না ফেলে বা অন্য পথে না নিয়ে যায়। আবার বলছি, আপনারা কেউ বিছানা ছেড়ে উঠবেন না। কেবিনের বাইরে যাবার চেষ্টা করবেন না। ধৈর্য ধরুন, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। লক্ষ দৈত্যের এই আক্রমণ আমরা প্রতিহত করবই। এটাই ড্রেক প্যাসেজের স্বভাব। ভয় পাবেন না।

আন্টার্কটিকা যাওয়া পাকা হয়ে যাবার পর কলকাতা ছাড়বার আগেই



আমরা প্রতিহত করবই। এটাই ড্রেক প্যাসেজের স্বভাব। ভয় পাবেন না।

আন্টার্কটিকা যাওয়া পাকা হয়ে যাবার পর কলকাতা ছাড়বার আগেই যখন আন্টার্কটিকা নিয়ে যেখানে যতটুকু যা জানা যায় জানবার চেষ্টা করছিলাম, তখনই এই ড্রেক প্যাসেজের কথা জেনেছি। এখানে এই প্যাসেজ একটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। ষোড়শ শতকে ফ্রান্সিস ড্রেক নামে একজন ইংরেজ নাবিক প্রথম এই সমুদ্রপথ আবিষ্কার করেন। তাঁর নামেই এই প্যাসেজের নাম।

প্রায় দু-আড়াই কোটি বছর আগে দক্ষিণ আমেরিকা আর আন্টার্কটিকার মধ্যে এই একটা সমুদ্রব্যবধান তৈরি হয়েছিল। এর মধ্যে চল্লিশ থেকে ষাট ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ বরাবর কোথাও কোনও ভূখণ্ড না থাকায় ড্রেক প্যাসেজ বাধাবন্ধনহীন উদ্দাম ঢেউ আর আদি-অন্তহীন উন্মাদ হাওয়ায় সবসময়ই ভয়াবহ রূপ ধরে থাকে।

ড্রেক প্যাসেজ পার হবার সময় আমরা দুই সমুদ্রের সঙ্গম বা আন্টার্কটিক কনভারজেন্স অতিক্রম করে আন্টার্কটিকা মহাদেশে প্রবেশ করলাম। এখানেই প্রশান্ত মহাসাগর আর আটলান্টিক মহাসাগর পরস্পরের সঙ্গে এসে মিলেছে। উত্তরের শীতল জল আর দক্ষিণের উষ্ণ জলের মধ্যে এ যেন একটা স্পষ্ট ভেদরেখা।

পরদিন খাবার ঘরে দেখা গেল ব্রেকফাস্টের সব টেবিল ফাঁকা। শুধু একজন এক হাতে দুটি স্লাইস রুটি ও দুটি-তিনটি সসেজ নিয়ে খাবার সাজিয়ে রাখা টেবিলেই ভর দিয়ে, জাহাজের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে খালি চেয়ারের দিকে এগোবার বৃথা চেষ্টা করছেন। টেবিলের ওপাশ থেকে পরিচারিকারা অভয় দিয়ে চলেছেন— সব টেবিলেই জাহাজের দুলুনি ঠেকানো ম্যাট পাতা আছে কিন্তু তাতে খুব একটা কাজ হচ্ছে না। তিনজন চেয়ার পর্যন্ত পৌঁছেছেন বটে, তবে সামনের টেবিলে দুহাতে কফির কাপ-ডিশ আগলে রাখার চেষ্টাতেই এত ব্যস্ত যে চুমুক দেবার সুযোগ পাচ্ছেন না। মেঝের সঙ্গে নাট-বল্টু দিয়ে আটকানো টেবিল-চেয়ারসুদ্ধুই জাহাজ মাতালের মতো টলছে।

আমি আগেরদিন থেকে বমি-মাথা ঘোরার ট্যাবলেট শুরু করে দিয়েছিলাম। আজ সকালে জাহাজের আইরিশ ডাক্তারের পরামর্শে পাউরুটিতে বেশি করে মাখন লাগিয়ে কলা ও গ্রিন টি সহযোগে কোনওক্রমে প্রাতরাশ সেরে নিতে পেরেছি। যদিও খাবার টেবিল পর্যন্ত পনেরো পা যেতে প্রায় পাঁচ মিনিট লেগে গেল।

এ এক অদ্ভুত অবস্থা। প্রায় সব চেয়ার-টেবিল ফাঁকা, দুয়েকজন বাদে কেউই খেতে আসেনি। এখানে আসবার পথে দেখলাম সব বন্ধ কেবিনের দরজায় ঝোলানো বমি করার প্লাস্টিকের খালি প্যাকেটগুলো আর বিশেষ খালি নেই।

পরশু মাঝরাতে শুরু হয়ে আজ দুপুর পর্যন্ত সমুদ্রের এই তাণ্ডব চলল। বেলা আড়াইটে নাগাদ জাহাজের ভয়াবহ দুলুনি কমে এল। আরও ঘণ্টাখানেক পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলেও অবেলার মধ্যাহ্নভোজে অল্প কয়েকজনকেই দেখা গেল।

রাতে এর বিপরীত ছবি। জাহাজের ডাইনিং হলে নানা দেশ, নানা ভাষা, নানা মুখ, নানা পরিধানের যেন এক মহাসম্মেলন। একেকটা টেবিলে ছ-আটজন করে বসেছেন। আন্টার্কটিকা যাবেন বলে সকলের মনেই বেশ উত্তেজনা। সকলেরই বাসনা, পেঙ্গুইনদের স্বদেশ আর হিমবাহ-হিমশৈলের স্বর্গরাজ্য স্বচক্ষে দেখবেন। অনেকেরই খাবার টেবিলে পরস্পরের সঙ্গে দিব্যি চেনাজানা হয়ে গেল। অথচ একবেলা আগেও কেউ কাউকে চিনতেন না।

যাঁর জন্য জাহাজ ছাড়তে দেরি হয়েছে অনেকেই আন্দাজে একে ওকে তাকে সেই ব্যক্তি ভেবে সহানুভূতি জানাতে লাগল। কেউ কেউ বিলম্বের কারণ নিয়েও বিশদ শুনতে চায়। যতক্ষণ না জানা যাচ্ছিল এই ব্যক্তি সে ব্যক্তি নয়, ততক্ষণ তার ভাগ্যে এরকম অযাচিত সহানুভূতি জুটতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করা হল সেই আসল ব্যক্তিটি খাবার ঘরেই আসেননি। ফলে যা ছিল নিছক একটা কৌতূহল, তা-ই ক্রমশ সংশয়ের বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

সন্দেহজনক একজন যাত্রীর কথা আমি আগেই শুনেছিলাম। জাহাজে ওঠার আগের রাতে বন্দরের কাছেই উশুয়াইয়ার যে হোটেলে ছিলাম, সকালে সেখানেই ব্রেকফাস্ট সেরে নির্দেশমতো আমার লাগেজ ঘরের সামনে বের করে রেখে, জাহাজে বমি-মাথা ঘোরার প্রতিষেধক স্টুজোর্ন আর ডমস্ট্যাল ট্যাবলেট কিনতে যখন বেরিয়েছিলাম, তখন ওষুধের দোকানের সামনে দুজন অচেনা লোকের আলোচনা কানে এসেছিল। মনে হয় তারা বন্দরের গোয়েন্দা-পুলিশ। চুরুট খেতে খেতে স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলছিল। ওই ভাষাটা আমি বেশ কিছুটা বুঝতে পারি। তাদের কথা থেকে ঝাপসামতো এইটুকু বুঝেছিলাম যে আজ আন্টার্কটিকাগামী জাহাজের একজন যাত্রীর গতিবিধি কিছুটা সন্দেহজনক। তাঁর আন্টার্কটিকা অভিযান নিছক ওই শ্বেত মহাদেশ দেখার জন্য নয়। অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে। তিনি অন্যদের মতো জাহাজ ছাড়ার আগের দিন উশুয়াইয়ার হোটেলে থাকার জন্য ঘরও বুক করেননি।

ওষুধ কেনার ছলে খুব বেশিক্ষণ দাঁড়ানো ভালো দেখায় না, তাছাড়া আমার তখনও হাঁটুজলে ও বরফে হাঁটার রবারের জুতো ভাড়া নেওয়া বাকি।

যে মেয়েটির দোকান থেকে পায়ের মাপমতো জুতো ভাড়া নিয়েছি তাকেই পরে জাহাজে দেখে অবাক হয়েছিলাম। মেয়েটি বিকেল পর্যন্ত জুতো ভাড়া দেবার দায়িত্বে ছিল, সন্ধে থেকে জাহাজে ডিউটি। আসলে যে সংস্থাটি এই অভিযানের আয়োজক, জুতো ভাড়া দেবার দোকানও তাদের। মেয়েটি সেই সংস্থারই কর্মচারী। অভিযানের আগে জুতোর দোকানের কাজ শেষ করার পর শুরু হয় তার জাহাজের ডিউটি। প্রতিদিন যাত্রীদের কেবিন সাফসুতরো রাখার গুরুদায়িত্ব যাদের, সে সেই কর্মীবাহিনীর নেত্রী। তাছাড়া বিলম্বে আসা বিশেষ যাত্রীটির দেখাশোনার দায়িত্বও নাকি তাকেই দেওয়া হয়েছে।

মেয়েটির নাম মারিয়া। তার কাছেই আমি এসব কথা জেনেছি। আমি টিভির জন্য ছবি তুলতে এসেছি শুনে সে গালে হাত দিয়ে চোখ গোল করে ফরাসিদের মতো এমনভাবে 'ও লা লা' বলে উঠল, যেন এর চাইতে বেশি অবিশ্বাস্য আর কিছুই হয় না।

অজানা জিনিস নিয়েই বোধহয় মানুষ সবচেয়ে বেশি কথা বলে। একবার শোনা গেল এই রহস্যময় যাত্রীটি নাকি নেপালের রাজপ্রাসাদের প্রধান পুরোহিত। পরে এ সংবাদের আরও শাখাপ্রশাখা ছড়াল। একজন বললেন ইনি আসলে কম্বোডিয়ার বিস্ময়কর প্রাচীন আঙ্কোরভাটের পুরোহিতদেরই বংশধর, নেপালে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আঙ্কোরভাট মানে আঙ্কোর-মন্দির। আর সব ছেড়ে মানুষটা বিশিষ্ট কোনও পুরোহিতই বা কেন হতে যাবেন সেও এক ধাঁধা।

এক জার্মান তরুণী ভদ্রলোককে একেবারে সামনা-সামনি দেখেছেন, তিনি বললেন, 'রাজপুরোহিত কিনা জানি না, তবে কোনও মোঙ্গোলিয়ান রাজপুরুষ হওয়া খুবই সম্ভব। আমি মোঙ্গোলিয়ার নানা অঞ্চলে ঘুরেছি, ওঁর মুখের আদল ওদেশের অভিজাত পুরুষদের মতো।'

কে তিনি, কেনই বা তাঁর গতিবিধি সন্দেহজনক, তাঁকে দেখতেই বা কেমন— এইসব জানতে আমাকে কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল, যতদিন না মহাসমুদ্রের বুকে প্রথম দ্বীপ দেখতে পেয়ে 'ল্যান্ড হো!' বলে সবাই চেঁচিয়ে উঠেছিল। ঠিকমতো বলতে গেলে, প্রথম দ্বীপ দেখতে পাবার মুহূর্তে নয়, সেই দ্বীপে ল্যান্ডিংয়ের সময় আমি প্রথম তাঁর দেখা পাই।

তখনও জানতাম না শুধু এই রহস্যময় ব্যক্তিটিই নয়, আরও সন্দেহজনক ও সাংঘাতিক দুজন যাত্রীও আমাদের সঙ্গে আন্টার্কটিকা চলেছে। নীচের ডেকে লোহার খাঁচায় ছ-সাতটা হাস্কি কুকুরও নাকি তাদের। এই জাহাজে যাত্রীপিছু যা ভাড়া, কুকুরের জন্য তার দ্বিগুণ ভাড়া দিয়ে কুকুরগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেটাও অনেক পরে জেনেছি। ভীষণ

চেহারার এতগুলো কুকুর সঙ্গে নিয়ে কেউ আন্টার্কটিকা কেন যাচ্ছে সেই রহস্য ভেদ করার মুহূর্তগুলোর চেয়ে বেশি ভয়ানক সময় আমার জীবনে আর আসেনি।

৩

ডাইনিং হলে দুদিকের দেওয়াল ঘেঁসা টেবিলগুলো থেকে হঠাৎ কোরাসের মতো একটা চিৎকার শুনে বাকিরা প্রায় সবাই আমরা গোলাকার জানলাগুলোর দিকে এগিয়ে গেলাম। যা দেখলাম তা আমাদের মতো ডাঙার প্রাণীদের পক্ষে এক বিস্ময়কর দৃশ্য। সমুদ্র যেন আদিগন্ত বরফের মাঠ, তাতে সবে ফাটল ধরেছে। চৈত্র মাসে বাংলার মাঠ-খেত যেমন ফেটে চৌচির হয়ে যায় পুরো সমুদ্রের জমাট বরফও তেমনি যতদূর চোখ যায় ফেটে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টুকরো হয়ে আছে।

লাঞ্চ টেবিলেই একজনের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি নিজে না বলে দিলে আমার পক্ষে তাঁকে আফগানিস্তানি বলে মেনে নেওয়া সম্ভবই ছিল না। গোঁফ-দাড়ি কামানো ব্যক্তিত্বময় মুখ, লম্বা মেদহীন চেহারার এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের ছেলেবেলায় দেখা কলকাতার দাড়ি-পাগড়িময় কাবুলিওয়ালার একতিল মিলও নেই। তাঁর পরিষ্কার ইংরিজি শুনেও প্রথমে একটু চমকেই উঠেছিলাম।

নানা কথার মধ্যে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি হঠাৎ আন্টার্কটিকায় যাচ্ছেন কেন? দীর্ঘকাল ধরে নিজের রুক্ষ পাহাড়ি দেশের যুদ্ধ-মারামারি দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে এবার চলেছেন পেঙ্গুইন আর তুষারভাস্কর্যের সৌন্দর্য দেখতে?'

ভদ্রলোক প্রথমে মাথা নামিয়ে যেন খাবার প্লেটে চোখ রেখে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর মাথা তুলে আমার দিকে চেয়ে থেকে কোনও চিন্তায় ডুবে গেলেন, খানিকক্ষণ এরকম নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে থেকে মুখ খুললেন। ধীর গলায় বললেন, 'বামিয়ানে বুদ্ধমূর্তি ভাঙার কথা শুনেছ নিশ্চয়ই? আফগানিস্তান থেকে বুদ্ধ উচ্ছেদের ভাবনা আমারই মস্তিষ্কপ্রসূত।'

বলে আবার ভদ্রলোক নিজের ভেতরে ডুব দিলেন। আমিও মনের দুর্বিষহ বিস্ময় চেপে রেখে নিঃশব্দে সুপ খেতে লাগলাম।

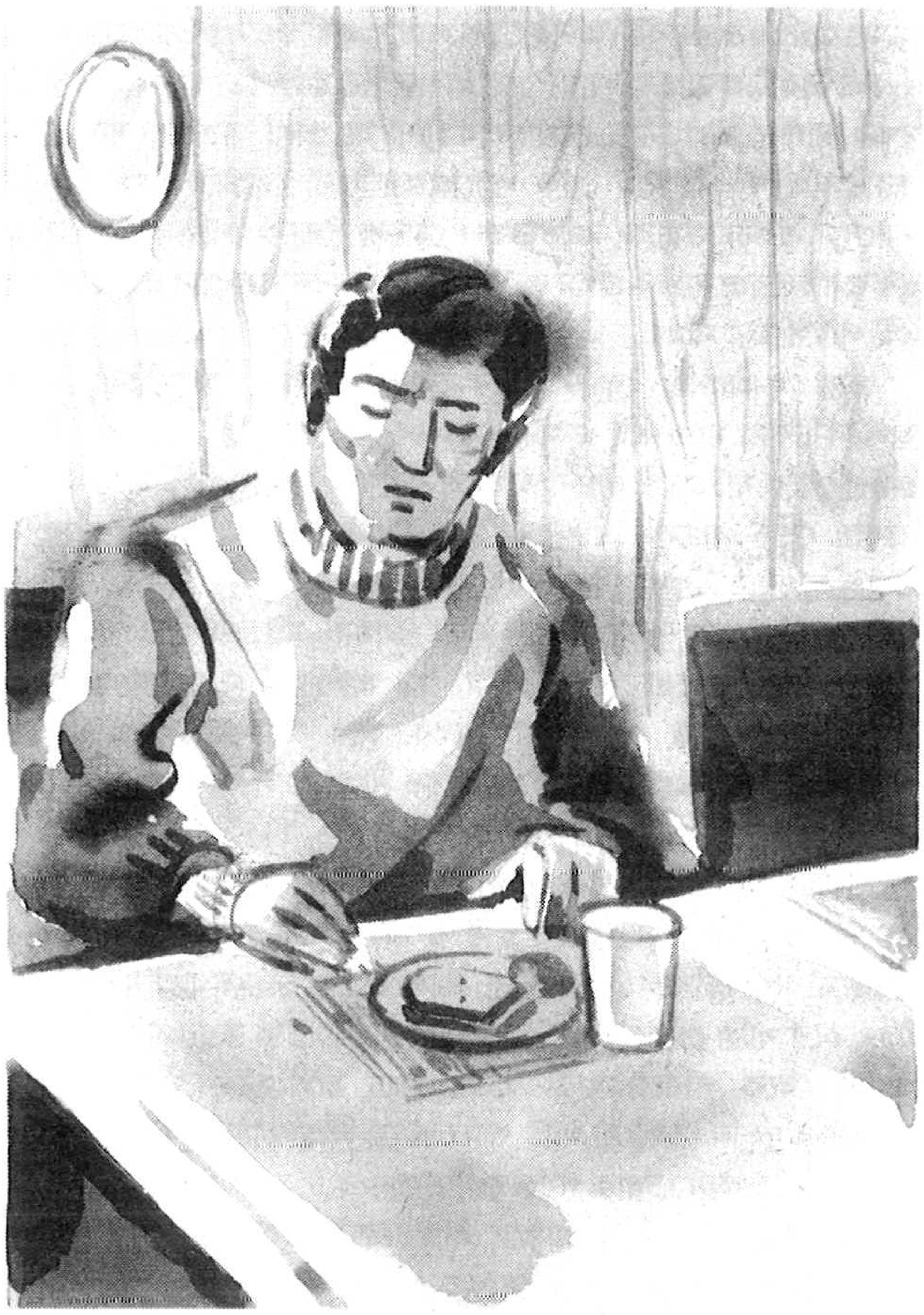
'বামিয়ানের বুদ্ধের চোখদুটি তুমি কি কখনও দেখেছ? ছবিতে, বা কোনও ভাস্কর্যে? মানুষের অমন চোখ সহজ কথা নয়। পাহাড়ের গুহায় বুদ্ধের ওই সুপ্রাচীন মূর্তিটি ভাঙার পর থেকেই ওই আশ্চর্য চোখ আমার মনে গেঁথে গেছে। প্রথমে দিনের বেলা হঠাৎ হঠাৎ ওই চোখ আমার মনে ভেসে উঠত। তারপর কী দিন, কী রাত— সবসময় চোখদুটি আমার দিকে চেয়ে থাকত। আমার ঘুম পর্যন্ত ছুটে গেল। সারারাত মনে হত আমি যেন একটানা স্বপ্নে ওই চোখ দেখেই কাটাচ্ছি।'

আবার নীরব, সেই নিজের মধ্যে ডুব।

আমার মুখেও কথা নেই।

আবার সেই একইরকম ধীরে ধীরে শুরু করলেন, 'আমার নানার আব্বার লেখা একটা পুঁথি ছিল, পুস্তু ভাষায় আগাগোড়া হাতে লেখা পুঁথি, বুদ্ধের অনেক উপদেশ খুব সহজ করে বলা ছিল সেই পুঁথিতে। সেই পুঁথি ছিল আমার নানির কাছে একটা পাথরের বাক্সে, সবুজ রঙের পাথরের বাক্স। খুব আশ্চর্যের কথা— বুদ্ধমূর্তি ভাঙা যেদিন শেষ হল, সেদিন রাতে সেই পুঁথি কী করে জানি না আমার চোখে পড়ল। পুরো পুঁথিটা আমি দুবার পড়লাম, ভোর না হয়ে গেলে হয়তো আরও পড়তাম। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ নিয়ে, তার কার্যকারণ নিয়ে এত ভেবেছিলেন বুদ্ধ আমার কোনও ধারণাই ছিল না।'

তিনি আবার থামতে আমি শুধু অপেক্ষা করে রইলাম। এবারও নিজে থেকেই শুরু করলেন, 'তাঁর চোখদুটি আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরতে লাগল। খুব গোপনে প্রথমে পাকিস্তানে পরে সেখান থেকে ভারতে



পালিয়ে বেড়াতে লাগলাম। এই পালিয়ে বেড়ানো— আমার আফগানিস্তানের সঙ্গীদের কাছ থেকে, নাকি আমার নিজের কাছ থেকে জানি না।

'ভারতের গয়া, কাশী, সারনাথ ঘুরে নেপালের লুম্বিনিতে বুদ্ধের জন্মস্থানে কিছুদিন কাটিয়েছি। কিছুতেই আমার মনের অশান্তির আর উপশম হল না। এখন চলেছি আন্টার্কটিকায়। শুনেছি সেখানে কোনও মানুষ নেই, তাই মানুষে মানুষে হানাহানিও নেই। এতদিনে একটা কথা বুঝেছি, আমার এই অশান্তি, এই অনিদ্রার মূলে মানুষের মধ্যে হানাহানি, হত্যা, হিংসা, ধ্বংস। শুধু তো আফগানিস্তানের পাহাড়-প্রান্তর নয়, আমার বুকের পাঁজর, হৃদয়ের অন্তস্তলও ছিল হত্যার হুংকারে ভরা। বুদ্ধের শান্ত চোখদুটি সবসময় আমাকে যেন এইসব ভয়াবহ হত্যা হিংসা হানাহানির কুফলের কথা বলেই চলেছে।'

হঠাৎই আমার মনে বিদ্যুচ্চমকের মতো একটা প্রশ্ন ছুটে এল, ইনিই সেই সবচেয়ে দেরিতে আসা রহস্যময় আগন্তুক নন তো? আমি সেই প্রশ্নই করলাম, 'আপনি তাহলে ভারত থেকে আসছেন? ভারতের মুম্বই থেকে সাউথ আফ্রিকান এয়ারে বুয়েনস আইরেস এসেছেন? আপনার বিমান ঝড়ে সাউথ আফ্রিকায় কোথাও নেমে পড়তে বাধ্য হয়েছিল? আপনিই কি বারবার জাহাজ না ছেড়ে দেবার অনুরোধবার্তা পাঠিয়েছিলেন?'

'না, না। আমি উশুয়াইয়ায় এসেছি আঠেরোই নভেম্বর। জাহাজ তো ছাড়ল উনিশে।'

এই সময় হোয়েলারের ঘোষণা শোনা গেল— আপনাদের বাঁদিকে দেখুন। খুবই অস্পষ্ট হলেও দেখতে পাচ্ছেন কিছু? বিরাট একটা কুঁজওলা উটের মতো ওই দূরে একটা আইসবার্গ ভেসে চলেছে।

প্রথম আইসবার্গ অর্থাৎ হিমশৈল দেখতে যাত্রীদের অনেকেই জানলার

দিকে, অনেকে আবার বাইরে জাহাজের পিছনদিকে বোতে চলে গেলেন।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের মধ্যেই হোয়েলারের উল্লসিত ঘোষণা— ডানদিকে দেখুন, আপনাদের ডানদিকে! দ্বীপ দেখা যাচ্ছে! ল্যান্ড, ল্যান্ড! ওখানেই আমরা প্রথম ল্যান্ড করব!

অমনি যাত্রীদের মধ্যে থেকে এলোমেলোভাবে বেসুরে চিৎকার উঠল— ল্যান্ড হো! ল্যান্ড হো! ল্যান্ড হো!

আধঘণ্টার মধ্যেই দেখা গেল সত্যিই একটা দ্বীপ। বলে না দিলে দ্বীপ বলে চেনাই যেত না। সাদা বরফের ঢিবি ছাড়া কিছু মনেই হয় না।

আরও কিছুক্ষণ পর জাহাজ জলের বুকেই স্থির হল। আর পাঁচতলার রেলিংয়ের গায়ে আটকে রাখা তিনটে জোডিয়াক বা মোটর লাগানো রবারের ডোঙা এমনভাবে জলে নামানো হল যেন আকাশ থেকে ভাসতে ভাসতে নেমে এল। প্রথম ডোঙা নামালেন দলপতি হোয়েলার, আকাশ থেকে ডোঙার ওপর দাঁড়িয়ে সোজা নেমে এলেন। পরেরটি একইভাবে নামালেন দক্ষ জোডিয়াক-চালক ভাজিক চানতুরিয়া। তৃতীয় জোডিয়াক নিয়ে যিনি নেমে এলেন শুনলাম তিনি একজন হিমবাহ বিশেষজ্ঞ। সবশেষে একইভাবে আরও তিনটি জোডিয়াক সমুদ্রে নেমে এল।

ইতিমধ্যে তিনতলার ডেক থেকে জাহাজের গা বেয়ে হালকা একটা সিঁড়ি নামানো হয়েছে, একেবারে নীচে দুজন বলবান লোক শক্ত হাতে সিঁড়ির শেষ প্রান্ত ধরে আছে। এক এক করে যাত্রীরা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে জোডিয়াকে উঠছেন, আমিও এক হাতে ক্যামেরা, এক হাতে নড়বড়ে সিঁড়ির রেলিং ধরে সাবধানে নীচে জলের দিকে নামছি, মনে হচ্ছে ভারি ভারি সব পোশাকের নীচে সারা শরীরে যেন বরফের চাদর জড়ানো। কেবিন থেকে বেরিয়ে, জাহাজের ভারি লোহার দরজা ঠেলে বাইরে সিঁড়ির মুখে পৌঁছনোমাত্রই প্রচণ্ড ঠান্ডা যেন জাপটে ধরে। অথচ এয়ারকন্ডিশনড কেবিনে আরামদায়ক ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠান্ডায় একটার ওপর আরেকটা পোশাক চড়াতে চড়াতে গরমে ঘেমে উঠেছিলাম। প্রথমে পশমের ড্রয়ার, পশমের ফুলহাতা আঁটো গেঞ্জি, তার ওপর গলা অব্দি হাওয়ারোধক পোশাক, তার ওপর আপাদমস্তক পার্কা। পায়ে প্রথমে সিল্কের, তার ওপর পশমের মোজা, তার ওপর তুষারে হাঁটার উপযুক্ত হাঁটু অব্দি রবারের জুতো। হাতেও দুপ্রস্থ দস্তানা, একটা উলের, তার ওপরেই আরেকটা চামড়ার, আর মাথায় অধিকাংশেরই বিদেশি সিনেমায় দেখা ঘন তুষারপাতের মধ্যে সৈনিকদের মতো ঠান্ডা-আটকানো টুপি। আমি পরেছিলাম প্রায় সারা মুখ ঢাকা, ঠাসবুনোট উলের তৈরি আমাদের হনুমান-টুপি। সকলের চোখেই আলট্রা ভায়োলেট রে থেকে চোখ বাঁচাবার কালো চশমা। প্রত্যেককেই বারবার বলে দেওয়া হয়েছে কোনও অবস্থাতেই যেন চশমা না খোলা হয়। এমনকি এই চশমা ছাড়া ক্যামেরার লেন্সের মধ্য দিয়েও দেখা নিষিদ্ধ।



যে দুজন সিঁড়ির শেষ প্রান্ত শক্ত করে ধরেছিল তারা মৃদু হেসে আমার হাতে ধরা ক্যামেরার দিকে ইঙ্গিত করে জানাল ক্যামেরা বা অন্য কিছু সঙ্গে নিতে হলে পিঠে রুকস্যাক নিতে হবে। জোডিয়াকে বসবার সময় যাতে দুটো হাতই খালি থাকে। জোডিয়াকের দুই কিনার বরাবর একটানা মোটা দড়ি বাঁধা আছে, সবসময়ই যে যার পিছনের দড়ির অংশটি শক্ত করে দুহাতে ধরে থাকতে হবে। আমার পিঠে রুকস্যাক নেই। অগত্যা ক্যামেরাটা পার্কা-র পকেটে ঢুকিয়ে নিলাম। অন্য পকেটে একস্ট্রা ক্যাসেট ও একটা স্ট্যান্ডবাই ব্যাটারি।

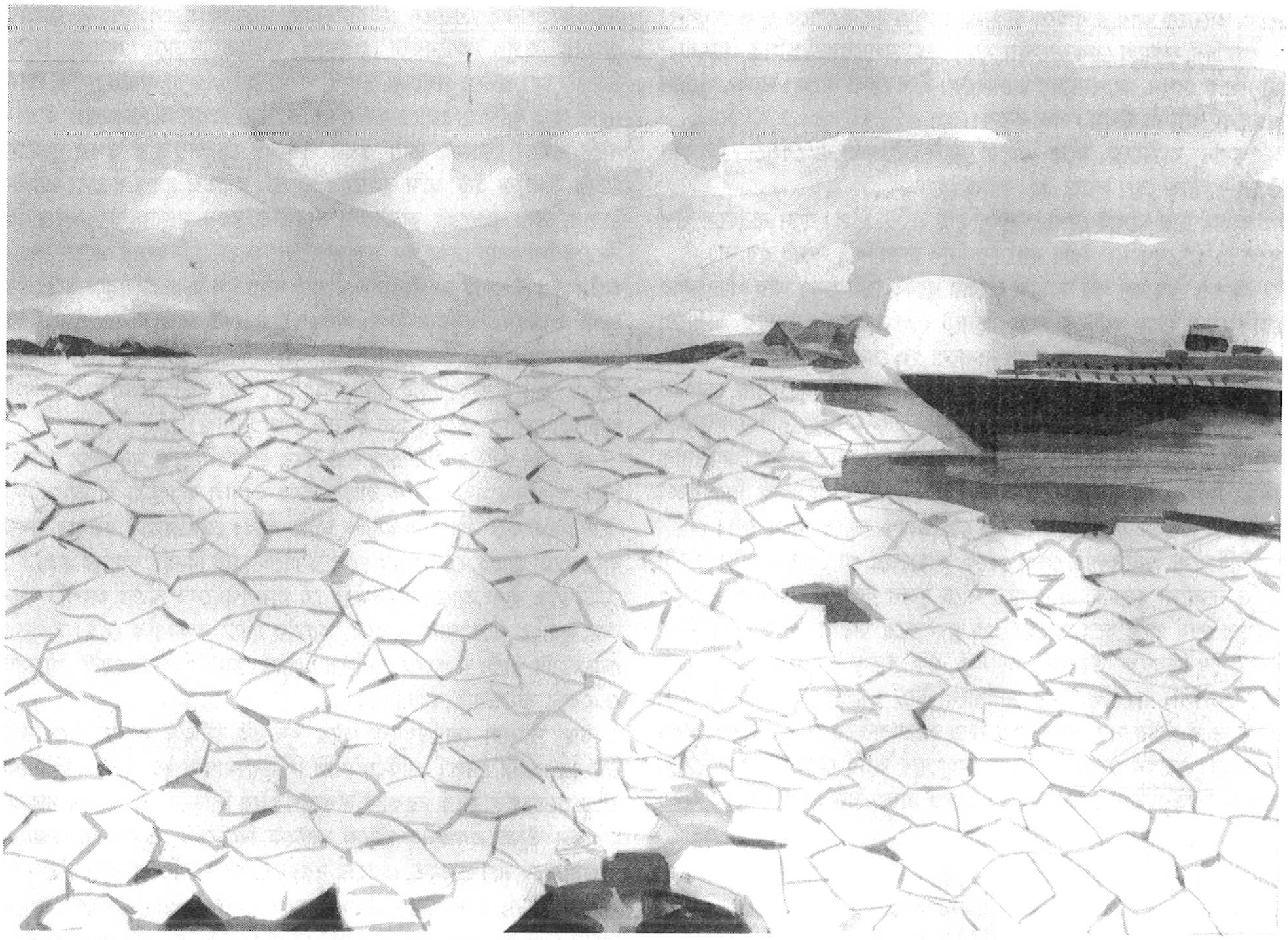
টাল সামলে জোডিয়াকে গিয়ে বসতেই সিঁড়ির মাথায় উত্তেজিত উচ্চস্বর শোনা গেল। তাকিয়ে দেখি সিঁড়ির মাথায় যে দুজন কর্মী একে একে প্রত্যেক যাত্রীকে দরকারি উপদেশ দিয়ে সিঁড়িতে পা রাখতে সাহায্য করছেন তাঁরা একজন যাত্রীকে আটকে দিয়েছেন, তাঁকে জোডিয়াকে নেওয়া হবে না। প্রথমত, লোহার দরজা ঠেলে জাহাজের বাইরে আসার মুখে দেওয়ালে ঝোলানো যাত্রীদের নাম ও কেবিন নম্বরের পাশে যেখানে 'আমি স্বেচ্ছায় ল্যান্ড করতে যাচ্ছি' লেখার নীচে নাম সই করে আসতে হয়, দেখা গেল সেখানে এই যাত্রী নাম সই করেননি। আরও একটা মারাত্মক অপরাধ— ইনি খুব বড় মাপের ব্যাগ নিয়েছেন, সেটা আবার পিঠে না বেঁধে হাতে করে, কখনও বয়ে কখনও টেনে নিয়ে এসেছেন। একে তো বড়, তার ওপর নিয়মবিরুদ্ধভাবে বওয়া ব্যাগ পরীক্ষা করতে যেতেই যাত্রীটি বিরক্ত হয়ে ওঠেন। কর্মীদুজন জোর করে ব্যাগ খোলা মাত্রই ওই যাত্রী নিজের ভাষায় গম্ভীর স্বরে তাঁদের তিরস্কার করতে থাকেন। নীচে জোডিয়াকে বসে স্পষ্ট কানে এলেও শুধু এই বুঝলাম যে এ ভাষা আমি কখনও শুনিনি, সিঁড়ির মাথার কর্মীদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, তাঁদের কাছেও এ ভাষা সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। তবে তিনি তিরস্কারই করুন আর আপত্তিই জানান, তাঁর কথার ভঙ্গিতে ও গলার আওয়াজে এমন একটা কিছু ছিল, যাতে আমি ছাড়াও কেউ কেউ তাঁর দিকে তাকাতে বাধ্য হল।

যাত্রীটিকে শেষ পর্যন্ত জাহাজের ভেতরে ফিরিয়ে নিয়ে যথাস্থানে নাম সই করিয়ে বড় ব্যাগসুদ্ধুই নীচে নামতে দেওয়া হল।

জোডিয়াকে উঠে বসার পর জোডিয়াক-চালক বিনীতভাবে জানতে চাইলেন— 'এত ভারি ব্যাগে কী নিয়ে যাচ্ছেন? আপনাকে নিশ্চয়ই মিঃ হোয়েলার স্কট বুঝিয়ে দিয়েছেন— জোডিয়াক থেকে প্রথমে আপনাকে একহাঁটু জলের মধ্যে নামতে হবে। সেই জল ভেঙে বরফে ঢাকা দ্বীপে গিয়ে উঠবেন। কঠিন বরফ আর প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়ার জন্য যে দ্বীপে প্রথম নামবার কথা ছিল আমরা সেখানে নামতে পারিনি আপনি নিশ্চয়ই জানেন?'

এতক্ষণে শুধু আমি নয়, জোডিয়াকের অন্যান্য যাত্রীও বুঝে নিয়েছি— ইনিই সেই রহস্যময় যাত্রী, এঁরই জন্য উশুয়াইয়ায় আমাদের চার ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে।

জোডিয়াক চালকের কথা শেষ হবার আগেই পরিষ্কার ইংরিজিতে



ভদ্রলোক বললেন, 'প্লিজ কোয়েঞ্চ দ্য থার্স্ট অব ইয়োর কিউরিয়স মাইন্ড (আপনার কৌতূহলী মনের তৃষ্ণা মেটান)।' বলতে বলতে নিজেই ব্যাগ খুলে ধরলেন। দেখা গেল তার মধ্যে বেশ কয়েকটি ছোটখাটো অচেনা জিনিসপত্র ছাড়াও বেশ ভারি একটা যন্ত্র রয়েছে। দেড়-দুহাত লম্বা, হাতখানেক চওড়া, নানারকম মিটার লাগানো অদ্ভুত ধরনের যন্ত্র।

যন্ত্রটির চেয়েও মানুষটির মুখ আমাকে বেশি আকৃষ্ট করল। ইনি নিশ্চয়ই কোনও এশীয় দেশের মানুষ। কখনও মনে হয় যেন আমাদের মণিপুরের অধিবাসী, কখনও মনে হয় তাইল্যান্ডের, অথবা হয়তো ফিলিপিনো। কেন জানি না, তাঁর মুখের ওপর আমার দৃষ্টি যেন আটকে গেছে। ধরি ধরি করেও ঠিক ধরতে পারছি না— ইনি কোন দেশি, কোন জাতি, কোন ভাষাভাষী? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হল ইনি কোনও তিব্বতি বণিক বা সে-দেশের ধর্মীয় নেতা নন তো?

হঠাৎ বড় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে জোডিয়াক চালু হল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ভদ্রলোকের চোখ পড়ল আমার ওপর। জোডিয়াক ছোট ছোট আইসবার্গ বা হয়তো সমুদ্রের ভাঙা বরফটুকরোর ওপর দিয়ে অনেকটা ব্যাঙের মতো লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চলেছে।

এই সুযোগ আমি ছাড়তে পারি না। দড়ি ছেড়ে দিয়ে ক্যামেরা নিয়ে কোমর বেঁকিয়ে জলের ওপর যতটা সম্ভব ঝুঁকে ছবি তুলতে লাগলাম। ওই অবস্থায় আমার চোখে পড়ল অল্প দূরে বিরাট একটা গ্লেসিয়ার— যেন সমুদ্রফুঁড়ে উঠেছে। জোডিয়াক সেদিকে বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতে আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না, সোজা উঠে দাঁড়িয়ে নিষেধাজ্ঞা ভুলে কালো চশমা ঠেলে কপালে তুলে দিয়ে ক্যামেরা তাক করলাম।

জোডিয়াক-চালক লাফ মেরে আমার কাছে এসে ধমক দিয়ে বেশ কড়া গলায় বললেন, 'বসুন, বসে পড়ুন। জলে পড়লে আমরা আপনাকে তুলে নেব ঠিকই, কিন্তু তাতে আপনার কিছু যাবে-আসবে না, কেননা এই বরফজলে দশ-পনেরো মিনিট হাবুডুবু খেলে শরীরের রক্তচলাচল বন্ধ হয়ে আপনি আর বেঁচে থাকবেন না।'

তা বলে এইরকম দৃশ্যের সামনে ক্যামেরা বন্ধ রেখে বসে থাকা যায়? এ শুধু কষ্টের নয়, যন্ত্রণার। হঠাৎ দেখি সেই ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ নজরে চেয়ে আছেন। সন্দেহ হচ্ছে তিনি হয়তো অনেকক্ষণ এইভাবেই আমার মুখে কিছু একটা আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছেন।

ঠিক তাই-ই। আমি যখন আরেকবার ক্যামেরা বাগাবার ফাঁক খুঁজছি, ভদ্রলোক হঠাৎই আমাকে বললেন, 'আই হ্যাভ সিন ইউ বিফোর। প্লিজ হেলপ মি আইডেনটিফাই।' (তোমাকে আমি এর আগে দেখেছি। ঠিক চিনতে পারছি না, একটু সাহায্য করো তো।)

৪

ভদ্রলোকের কথা শুনেই আমার চোখের সামনে থেকে নিমেষে একটা পর্দা সরে গেল। বছর কয়েক আগে আমি এক দেশের এক রাজার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, সে-দেশের রাজা তাঁর প্রধানমন্ত্রীর একটা কাজ একেবারেই পছন্দ করেননি। প্রধানমন্ত্রীর সেই ভুলে রাজ্যে অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল, সেইসময় রাজা তাঁর বৃদ্ধা মায়ের উপদেশে প্রধানমন্ত্রীকে এই বলে শিক্ষা দিয়েছিলেন— যে শাস্তি নিজেকে দেওয়া যায় না সেই শাস্তি অন্যকে দেওয়া উচিত নয়। ঘটনাটি ছিল এই— দেশের হাজার হাজার গরিব মানুষ পেটের দায়ে বে-আইনি জেনেও ড্রাগ চোরাচালানকারীদের উসকানিতে লুকিয়ে-চুরিয়ে আফিম চাষ করছিল, প্রধানমন্ত্রী তা কিছুতেই দমন করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনীকে

দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সেনাবাহিনীর নির্বিচার গুলিবর্ষণে এক সপ্তাহে বাইশ হাজার দরিদ্র প্রজাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। তাই নিয়ে দেশ জুড়ে প্রতিবাদের আগুন জ্বলে।

শেষ পর্যন্ত তা সামাল দিয়েছিলেন রাজা স্বয়ং, কেননা তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি, দয়া, মায়া, করুণার জন্য তাঁকে দেশের লোক ঈশ্বরের অবতার বলে পূজা করত।

এ যুগের সত্যিকার কোনও রাজাকে নিয়ে একটা আধুনিক রূপকথা লেখবার ইচ্ছে আমার অনেকদিনের। যেসব দেশে এখনও রাজার শাসন চালু আছে সেসব দেশের রাজারাজড়ার খবর পড়া আমার একটা নেশা।

এই দেবতুল্য রাজার কথা পড়ে আমার রূপকথা লেখার ইচ্ছেটা তীব্র হয়ে উঠেছিল। বিনীতভাবে আমার সেই ইচ্ছে জানিয়ে সে-দেশের রাজাকে তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে চিঠি লিখে বসলাম।

তিন মাস অপেক্ষা করেও কোনও উত্তর না পেয়ে আবার চিঠি লিখি। এরপরও কোনও উত্তর না আসায় আমি অস্ট্রেলিয়ার এক আদিবাসী রাজার বংশধরকে নিয়ে লেখা আমার একটা ছোট গল্পের ইংরিজি অনুবাদ রাজাকে পাঠিয়ে শেষবারের মতো মাত্র তিন ঘণ্টার জন্য তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করি।

এইবার সে-দেশের বিদেশসচিব আমাকে রাজার সানুগ্রহ সম্মতি জানিয়ে চিঠি লেখেন। সেইমতো বিদেশসচিবের নির্দেশ অনুসারে ডিসেম্বরের এক সকালে আমি সে-দেশের রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে জানতে পারি যে প্রতিবেশী রাজ্যের কোনও বিশেষ অতিথিকে নিয়ে রাজা সেদিনই সকালে রাজধানী ছেড়ে তাঁর শীতকালীন প্রাসাদে চলে গেছেন। বিদেশসচিব আমাকে এও জানালেন যে সেখানে আগামীকাল বিকেল চারটেয় রাজা আমাকে দর্শন দেবেন। আমার যাবার ব্যবস্থাও বিদেশমন্ত্রক করে রেখেছেন। রাজার শীতকালীন প্রাসাদ রাজধানী থেকে সাতশো কিলোমিটার দূরে, পার্বত্য এলাকায়, একেবারে পাহাড়ের গায়ে।

পরদিন যথাসময়ে সেখানে পৌঁছনোমাত্র রাজার দুজন অফিসার এসে আমাকে প্রাসাদ-অভ্যন্তরে ছোট অথচ ভারি সুন্দর একটা ঘরে নিয়ে বসালেন। পুরো প্রাসাদটি কাঠের তৈরি। এই ঘরটিও কাঠের। আগাগোড়া সূক্ষ্ম কারুকার্য করা।

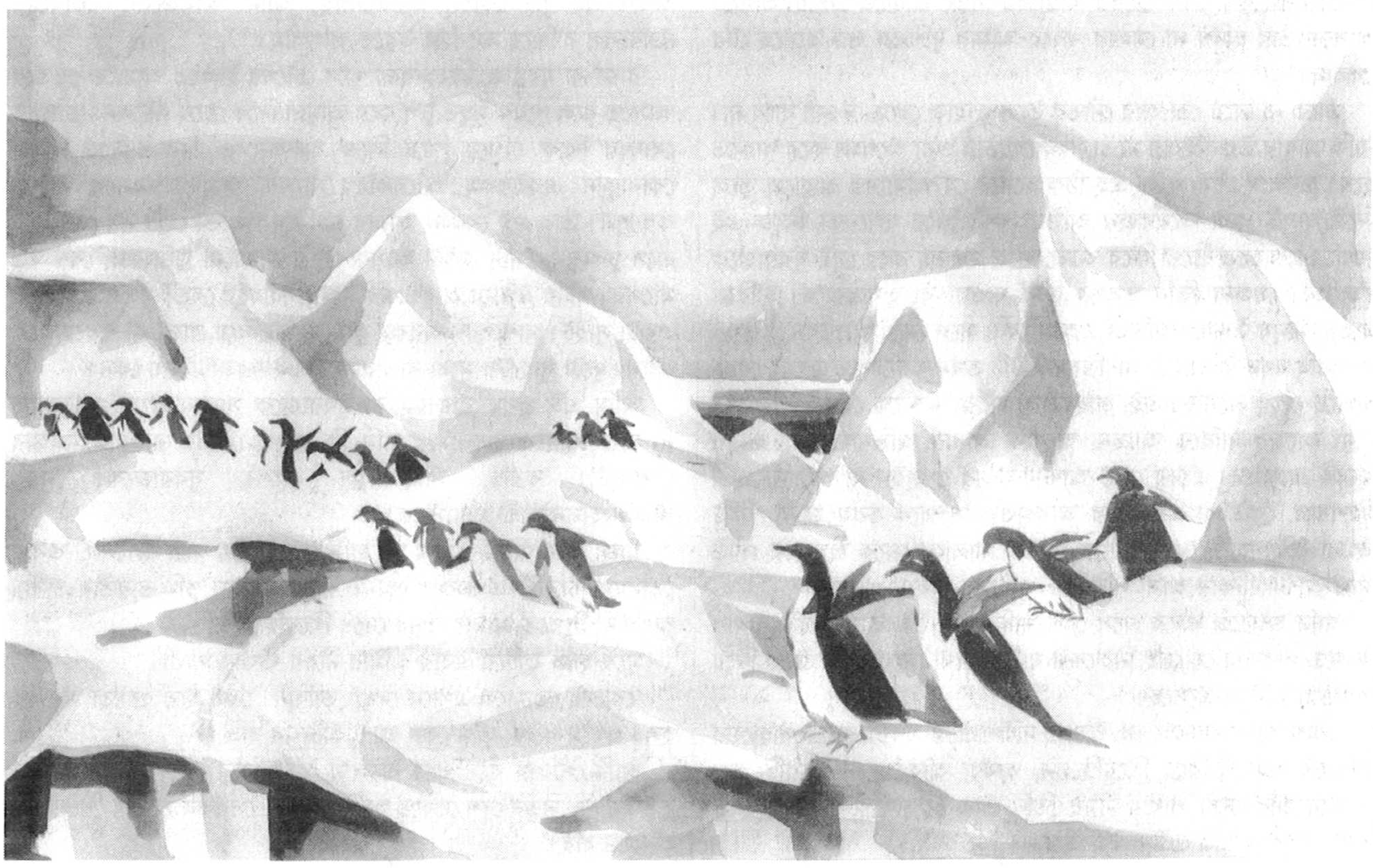
এত দূর আসতে পেরেছি, বসে বসে নিজের সেই ভাগ্যের কথা ভাবছি, এমন সময় তিনজন সঙ্গী নিয়ে স্বয়ং রাজা ঘরে ঢুকে আমার দিকে এগিয়ে এসে দু-হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি অবাক হবারও সময় না পেয়ে ছিটকে উঠে দাঁড়িয়ে কোমর ভেঙে রাজাকে অভিবাদন জানালাম। রাজা মুখে ভারি নির্মল হাসি নিয়ে হাত ধরে আমাকে বসালেন ও নিজে সিংহাসন গ্রহণ করলেন। সঙ্গের তিনজনের দুজন রাজাকে সিংহাসনে বসিয়ে চলে গেলেন। একজন রয়ে গেলেন, তিনি বসলেন রাজার ডানদিকে একটা সুসজ্জিত চেয়ারে। তিনিই এখন জোডিয়াকে, আমার কাছে জানতে চাইছেন আমাকে তিনি কোথায় দেখেছেন।

আমার চোখের সামনে থেকে একের পর এক পর্দা সরে যাচ্ছে। মনে পড়ে গেল, রাজা আমাকে বলেছিলেন— তুমি যদি এযুগের রাজাকে নিয়ে রূপকথা লিখতে চাও তাহলে আমার নয়, এঁর জীবনকাহিনী তোমার জানা দরকার। ইনি আমার প্রতিবেশী দেশের অত্যন্ত বিদ্বান ও গুণবান যুবরাজ। আমার জ্যোতিষী স্বয়ং এঁর কোষ্ঠী বিচার করে বলেছেন এঁর সন্ন্যাসযোগ প্রবল। যদি সত্যিই একালের রাজার সুখ-দুঃখের কথা জানতে চাও এঁর কথাই তোমার জানা দরকার।

সেবার শেষ পর্যন্ত আমার রূপকথা লেখা হয়নি ঠিকই, তবে রাজার কথায় ব্যবহারে মন আমার কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল। রাজার নির্দেশে, তাঁকে কথা দিয়েছিলাম, রূপকথা লিখি বা না লিখি তাঁর দেশের নাম বা তাঁর প্রতিবেশী এই বন্ধু যুবরাজের দেশের নাম আমি কখনও প্রকাশ করব না।

সেই যুবরাজই কি তবে সন্ন্যাসী হয়ে আন্টার্কটিকা যাচ্ছেন? তিনি কি এখনও যুবরাজ, না রাজা? এই মুহূর্তে আপাদমস্তক ঢাকা পোশাক দেখে ভেতরের মানুষটিকে বোঝার উপায় নেই।

বরফে ঢাকা একটা দ্বীপের সামনে জোডিয়াক এসে থেমেছে। একে তো বরফে ঢাকা, তার ওপর ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মতো তুষারপাত হচ্ছে।



সকলেই একে একে জলে নেমে দ্বীপের দিকে এগিয়ে চলেছে। আমাদের দলনেতা হোয়েলার আগেই এসে পৌঁছে গেছেন। তিনি বরফের ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেককে প্রথম স্থলভূমি, বা বলা ভালো, তুষারভূমি স্পর্শ করার জন্য স্বাগত জানিয়ে বললেন— 'ওয়েলকাম টু হাফমুন আইল্যান্ড।' এই সুযোগে যুবরাজ (জানি না এখনও তিনি যুবরাজ, নাকি রাজা) আমার কাছে এসে মৃদু স্বরে আমাকে বললেন, 'তোমাকে দেখে আনন্দ হল। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

দ্বীপের ভেতরদিকে অল্প এগোতেই চোখে পড়ল শত শত পেঙ্গুইন। এ হয়তো পেঙ্গুইনদের বসতি, বা ক্রীড়াঙ্গন। খেলছে, না মারামারি করছে জাহাজের পেঙ্গুইন-বিশেষজ্ঞের কাছে জানতে হবে। আপাতত কখনও ঝুঁকে, কখনও তুষারে হাঁটু গেড়ে বসে ক্যামেরা চালাতে লাগলাম। চারদিকের এইসব আশ্চর্য দৃশ্য ক্যাসেটবন্দি করতে করতে আমি নিজেই যেন দৃশ্যের ঘেরাটোপে বন্দি হয়ে গেছি।

আগেই বলে দেওয়া হয়েছিল এই দ্বীপে আমরা আধঘণ্টা থাকব। কেউ যেন বেশি দূরে না যান। যাত্রীদের মধ্যে একজন হালকা গোলাপি রঙের পার্কা পরে এসেছেন, তাঁকেও বারবার বলে দেওয়া হয়েছে একেবারেই অন্যদের চোখের আড়ালে না যেতে। নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকেরই গাঢ় লাল বা গাঢ় হলদে রঙের পার্কা পরে থাকা চাই, কেননা কেউ কোনও দ্বীপে বা ধু ধু তুষারক্ষেত্রের কোথাও হারিয়ে গেলে ধবধবে তুষারের ওপর দূর থেকে শুধু গাঢ় রং দেখেই তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে। জোডিয়াক থেকে দ্বীপে নামার জায়গাটাও সবাইকে ভালো করে চিনে রাখতে হবে।

হাফমুন আইল্যান্ড থেকে ফেরার সময় ছটি জোডিয়াক কয়েকবার করে ট্রিপ দেওয়া সত্ত্বেও হিসেব করে দেখা গেল আরও নজন তখনও দ্বীপে রয়ে গেছেন। শেষ জোডিয়াক শেষবারের মতো জাহাজের উদ্দেশে ফিরে আসার সময় আবিষ্কার করা হল সেই যুবরাজ এখনও বেপাত্তা। তিনি যে এর আগেই ফিরে যাননি সে বিষয়ে সকলেই নিশ্চিত। কে তাঁকে কোথায় খুঁজবে সে বিষয়ে কর্মীদের সকলেরই মনে সংশয়।

জোডিয়াকের শেষ ট্রিপের যাত্রীদের সঙ্গে জাহাজে ফিরে আসতে আসতে তাঁর হদিশ না মেলার খবরে আমার দুশ্চিন্তা শুরু হয়েছে টের পেলাম।

তাঁকে না নিয়ে তো আর নোঙর তুলে জাহাজ ছেড়ে দেওয়া যাবে না। নাকি আবার উশুয়াইয়ার মতো সকলকে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হবে! শুনলাম শেষ পর্যন্ত এই ঠিক হয়েছে যে আমাদের জাহাজে তুলে দিয়ে বাছাই করা কয়েকজন অভিজ্ঞ কর্মী নিয়ে দলনেতা নিজে এই জোডিয়াকে চড়ে দ্বীপে ফিরে আসবেন ও তন্নতন্ন করে সেই যুবরাজকে খুঁজবেন। সেজন্য তিনি তুষারে ডুবে যাওয়া বা তুষাররাজ্যে হারিয়ে যাওয়া মানুষ উদ্ধারে অভিজ্ঞ একজনকেও সঙ্গে নিয়ে আসবেন।

আমি যখন দ্বীপ ছেড়ে জোডিয়াকে উঠি তখন তুষারপাত ক্রমেই বেড়ে চলেছে দেখে এসেছি। এই জাহাজের কর্মীরা অনেকে যেমন জাহাজের নানা কাজের দায়িত্বে আছেন, অনেকে আবার অভিযান পরিচালনার জন্যই এসেছেন। এঁদের কেউ আন্টার্কটিকার পেঙ্গুইন বা অন্যান্য প্রাণী বিশেষজ্ঞ, কেউ বা এখানকার আবহাওয়া সম্পর্কে চরম জ্ঞানী, কেউ হিমবাহ বিশেষজ্ঞ, কেউ আবার শীতের আলাস্কা থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আন্টার্কটিকায় আসা পরিযায়ী পাখিদের বিষয়ে পণ্ডিত।

আমি জাহাজে ফিরে এসে বেশ খানিকক্ষণ উৎকণ্ঠায় কাটাবার পর জানতে পারলাম যে সেই নিরুদ্দেশ যাত্রীর দেখা মিলেছে ও তাঁকে নিয়ে জোডিয়াক ফিরে এসেছে।

ক্রমশ আরও জানা গেল, দ্বীপের দক্ষিণপ্রান্তে একটা তুষার-পাহাড়ের আড়ালে তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন, অথবা আত্মগোপন করেছিলেন। সেখানে তাঁর দেখা পাবার সময় তিনি তাঁর রহস্যযন্ত্রটি নিয়ে কোনও কিছুর হদিশ পাবার চেষ্টায় মগ্ন ছিলেন।

হোয়েলারের ঘোষণা শোনা গেল, আজ আরও একটা দ্বীপে নামবার চেষ্টা করা হবে। এই দ্বীপটির নাম ডিসেপশন আইল্যান্ড। সকলকে অনুরোধ করা হল তাড়াতাড়ি লাঞ্চ সেরে আবার দ্বীপে নামবার পোশাকে তৈরি হয়ে নিতে।

সবে নিয়মমতো রাসায়নিক মেশানো জলে পা ধুয়ে কেবিনে ঢুকে ভারি পোশাক-আশাক বদলাতে শুরু করেছি, আবার খেয়ে উঠেই সেসব গায়ে-মাথায় চড়াতে গলদঘর্ম হতে হবে ভেবে একটু অস্বস্তিই লাগল।

ডাইনিং হলে যাবার জন্য কেবিনের দরজা খোলার আগেই যে ব্রাজিলিয়ান মেয়েটি রোজ আমার কেবিন পরিষ্কার করতে আসে সে একটা চিরকুট দিয়ে গেল।

চিরকুটে লেখা: ডিসেপশন আইল্যান্ডে না নামলে খুব বেশি কিছু মিস করবে না। তার চেয়ে বরং লাঞ্চ সেরেই 'আমুন্ডসেন' স্যুইটে চলে এসো।

যিনি লিখেছেন, তাঁর নাম লেখা নেই। তা সত্ত্বেও আমার বুঝতে অসুবিধা হল না যে এ সেই যুবরাজের লেখা। তাছাড়া হাতের লেখাতে একটা বেশ ব্যক্তিত্ববান স্টাইল আমার নজর এড়াল না। সত্যি বলতে কী, 'আমুন্ডসেন' স্যুইট যেন একটা চুম্বকের মতো আমাকে আকর্ষণ করতে লাগল।

ডাইনিং হলে যথারীতি যুবরাজকে দেখা গেল না। হয়তো বিশেষ কোনও ব্যবস্থায় নিজের কেবিনে বসেই তিনি আহারপর্ব সেরে নেন।

অন্য সকলে যখন খাওয়ার মাঝপথে, আমি তখন তাড়াতাড়ি একটু স্যালাড আর সুপ খেয়ে আমুন্ডসেন স্যুইটের দিকে রওনা হলাম।

এই সারির কেবিনগুলোর সামনে যে করিডর ধরে এগোতে হয়, সেই করিডরের মুখে ভারি লোহার দরজা। রীতিমতো জোরে ঠেলতে হল। ডানপাশে পরপর সব কেবিন বা স্যুইট, বাঁপাশে সমুদ্র, স্বচ্ছ ফাইবার গ্লাসে ঢাকা বিমানের জানলার মতো জাহাজের দেওয়ালের গোল গোল জানলা দিয়ে দেখা যায়।

করিডরে ঢুকে দেখি পরপর দুটো কেবিনের দরজায় একজনেরই নাম লেখা। ভারি খটোমটো নাম, বানান অনুযায়ী উচ্চারণ করা অসম্ভব। অর্থাৎ এই দুটি কেবিন একজনেরই। আমি 'আমুন্ডসেন' কেবিনের ডোরবেল বাজিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

রাজা বা যুবরাজ স্বয়ং দরজা খুলে চোখের ইঙ্গিতে আমাকে ভেতরে আসতে বলে দুয়েক মুহূর্ত চুপ করে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর সোফার দিকে এগিয়ে গিয়ে নিজে বসলেন ও তাঁর বাঁদিকে কিছুটা কোনাকুনি একইরকম আরেকটা সোফায় আমাকে বসতে ইশারা করলেন। তাঁর এই কেবিন আমার কেবিনের মতো ছোট নয়। যে ঘরে এসে ঢুকলাম, সেটা একটা আসবাবপত্রে সাজানো ড্রয়িংরুম, বেশ বড় মাপের। পর্দার ওপারে আরও একটা ঘর, বোধহয় বেডরুম। এটা আসলে একটা স্যুইট। পাশাপাশি এরকম দুটো স্যুইট নিয়ে রাজা কী করছেন কে জানে। দুটো স্যুইটের মধ্যে যাতায়াতের ওই দরজাটাই বা কেন?

আমি এই প্রথম রাজাকে বা যুবরাজকে সামনে ঝুঁকে জোড়হাতে নমস্কার জানিয়ে বললাম, 'আমি কি অমুক দেশের রাজাকে নমস্কার ('স্যালুট') করছি, নাকি সে দেশের যুবরাজকে? নাকি রাজসিংহাসনত্যাগী সন্ন্যাসীকে?'

রাজা বা যুবরাজের মুখে মৃদু হাসি ফুটল। ধীর স্বরে বললেন, 'এবার তোমাকে চিনেছি। এখনকার কোনও রাজাকে নিয়ে তুমি ভারতীয় ভাষায় রূপকথা লিখতে আমার বন্ধুর দেশে গিয়েছিলে না?'

মুখে হাসি ফুটিয়ে এবার আমার নীরব থাকার পালা।

'বোসো, তোমাকে এখানে দেখব ভাবিনি। দেখা হয়ে হয়তো ভালোই হল। প্রথমে বলো, তুমি কেন আন্টার্কটিকায় যাচ্ছ?'

আমি সোফায় বসে পড়ে বললাম, 'ছোটবেলা থেকেই নতুন অঞ্চল, নতুন মানুষ, নতুন দেশ দেখতে আমি ব্যাকুল। সেরকম সুযোগ পেলেই তা আঁকড়ে ধরি।'

‘আন্টার্কটিকা অভিযানের সুযোগ পেলে কী করে?’

‘আমাদের কলকাতার একটা টিভি চ্যানেলে আন্টার্কটিকা ভ্রমণের ভিডিওচিত্র তৈরি করে দেবার শর্তে এখানে এসেছি। এর সব খরচ দিয়েছে সেই চ্যানেল।’

‘এটাই কি তোমার পেশা?’

‘না না, সে যোগ্যতাই আমার নেই। আমি এমনিতে লিখি। মনের ভাব-ভাবনা, বনের পশুপাখি, নতুন নতুন দেশ নিয়ে লিখতে ভালোবাসি। আমার দুয়েকটা বইও লোকে ভালোবাসে। দেশভ্রমণের ভিডিও ফিল্ম তৈরির কোনও শিক্ষাদীক্ষাই আমার নেই। আছে বলতে দেশ দেখার ব্যাকুলতা, যেখানেই যাই সেখানকার আশ্চর্য সব দৃশ্য ক্যাসেটবন্দি করা, আর তা আমার দেশের মানুষকে দেখাবার ইচ্ছে। এই তিন সম্বল করে আমি আমাজন, আলাস্কা, আফ্রিকার ওপর ভিডিও ফিল্ম বানিয়েছি। আমাদের দেশে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে অভিজ্ঞ, প্রতিভাবান, তথ্যচিত্র-নির্মাতাদের দিয়ে এইসব দূরদেশের আদর্শ ছবি বানানোর কথা কেউ ভাবতে পারে না বলেই আমার আনাড়ি হাতের তৈরি, তৃষাতুর চোখের দেখা এইসব দুর্বল চিত্ররূপ মানুষ ভালোবেসে দেখে। টিভি চ্যানেলের প্রযোজকরা আমাকে চান, তার কারণ এমন নামমাত্র খরচে এমন দূর দূর দেশের ছবি তাঁরা পাবেন কোথায়!’

ধৈর্য ধরে শুধু নয়, রীতিমতো মন দিয়ে রাজা এমনভাবে আমার কথা শুনছিলেন যে আমিও কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে নির্লজ্জের মতো অনর্গল নিজের সাতকাহন বলে গেলাম।

এই সময় হঠাৎই আমাদের দুজনকেই চমকে দিয়ে কেবিনের ঘোষণাযন্ত্রে হোয়েলারের গলা শোনা গেল— ডিসেপশন আইল্যান্ড যাবার জন্য সবাই কিউতে এসে দাঁড়ান, তার আগে নাম সই করতে ভুলবেন না। সিঁড়ির মুখে পৌঁছবার দরজা এখনই খোলা হবে।

শরীরের কোথাও মশা কামড়ালে যেমন বেখেয়ালেও সেখানে হাত চলে যায়, অনেকটা সেইরকমই সিঁড়ির মুখের দরজা খোলা হবে শুনেই আমি বোধহয় অজ্ঞাতে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। রাজা তা লক্ষ করে এক হাত তুলে আমাকে নিরস্ত করে বললেন, ‘ডিসেপশন আইল্যান্ড আসলে মৃত আগ্নেয়গিরির দ্বীপ। তোমার চোখের আরাম, মনের আনন্দ সেখানে মিলবে না। বোসো, হয়তো আরও বড় কোনও বিষয় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।’

কী বলব, কী বলা উচিত বুঝতে না পেরে আমি চুপ করে থাকি।

রাজাই আবার শুরু করলেন, ‘যা কিছু চোখে দেখছ, ক্যামেরায় তুলে নিচ্ছ, সেইসব দৃশ্যের বাইরে আরও অন্য দৃশ্যও তো থাকতে পারে, তাই না?’

‘হয়তো আছে, হয়তো নেই। বিশ্বজগৎ সম্পর্কে আমার জ্ঞান অত গভীর না।’

‘আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির বাইরে এই পৃথিবীতেই অনেক কিছুর অস্তিত্ব আছে, তুমি বিশ্বাস করো?’

এবার আমার একটু আশ্চর্য লাগল। এসব অত্যন্ত জটিল দার্শনিক ব্যাপারে আমার মতামত জানতে চাইছেন কেন? আমি একটু ভেবেই বললাম, ‘অত বড়, অত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশ্বাস-অবিশ্বাস করবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি আমার নেই।’

‘সিংহাসনের লোভে ভাই ভাইকে সপরিবারে হত্যা করে— এও কি বিশ্বাস করার? তা বলে কি এমন মর্মান্তিক ঘটনার পরও কেউ আর সে ঘটনা অবিশ্বাস করতে পারে?’

বছর-তিনেক আগে নেপালের রাজা বীরেন্দ্রকে একসঙ্গে সপরিবারে হত্যার ঘটনাটাই রাজা বোঝাচ্ছেন কি? তিনিও কি নেপাল-রাজবংশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও আত্মীয়? বা তাঁদের প্রতিবেশী কোনও রাজ্যের রাজা? এইসব ভাবছি, হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে ডিসেপশন আইল্যান্ডে যাবার ব্যাপারে হোয়েলারের লাস্ট কল শোনা গেল। সেটুকু সামলে নিয়ে বললাম, ‘আপনি ডিসেপশন আইল্যান্ডের কথা জানলেন কী করে? এখানে আসবার আগে এইসব দ্বীপের বিষয়ে সব তথ্য জেনেই এসেছেন?’

‘এর আগে আমি আরও দুবার এই পথে ঘুরে গেছি। তবে সে অন্য জাহাজে। একবার আঠেরোদিন ছিলাম, আরেকবার চব্বিশদিন। এবার তো ছ-সপ্তা থাকার কথা। এবার আন্টার্কটিকার আরও গভীরে যাওয়া যাবে।’

এই সময় দ্বিধা ঝেড়ে আমি বলে ফেললাম, ‘এত দূরে, এমন দুর্গম পথে ভারি একটা যন্ত্র নিয়ে বেরিয়েছেন কেন? জিনিসটা সম্পর্কে একটু জানতে পারি কি?’

‘যন্ত্রটা কিছুটা দিশি রেডারের মতো। বাদুড়ের দূরদৃশ্যের অনুভূতির সঙ্গে হাতির শ্রবণশক্তিও যন্ত্রটিতে রয়েছে। এইসব অঞ্চলে স্বভাবতই যা যা আছে, যেমন বরফ, জল, পাথর, পেঙ্গুইন, সিল বা সি-লায়ন— এইসব ছাড়া অন্য কোনও ধাতু বা বস্তু বা প্রাণী থাকলে তা এই যন্ত্রে বোঝা যায়। আবার জমাট বরফের নীচে বহু দূরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধ্বনিও এ যন্ত্রে ধরা পড়ে। উত্তরমেরু অঞ্চলে এস্কিমোরা গভীর বরফের তলা থেকে সিল শিকারের জন্য একটা হাতুড়ে যন্ত্র ব্যবহার করে, জিনিসটা তাদেরই তৈরি, তাদেরই কেউ সেই স্থূল যন্ত্রটিতে ক্রমশ নানা সূক্ষ্ম ম্যাগনেটিক শক্তি জুড়ে এই যন্ত্র তৈরি করেছিল। আমি এটা আলাস্কার একটা সাপ্তাহিক হাটে পুরনো জিনিসপত্রের মধ্যে থেকে কিনেছি। দোকানি-মেয়েটির থুত্থুড়ে দিদিমা কিংবা ঠাকুমার সঙ্গে কথা বলে আমি এই যন্ত্রটির বিষয়ে এইসব তথ্য জেনেছি।’

‘আপনি হাটে গিয়েছিলেন! তখন কি আপনি যুবরাজ, না রাজা?’

‘ওসব মানুষের বাইরের পরিচয়।’

এর বেশি আর কিছু তিনি বললেন না।

‘এই ক্রুজ বা এক্সপিডিশনের লোকেরা বা জাহাজের লোকেরা আপনার পরিচয় জানে না?’

‘তাঁরা আমাকে জানেন আমার দেশের প্রাচীনতম ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর হিসেবে। আর সত্যিই আমি তাই।’

‘এটা তো আংশিক সত্য।’

‘পুরো সত্য জানবার শক্তি সকলের থাকে না। হয়তো তার প্রয়োজনও হয় না।’

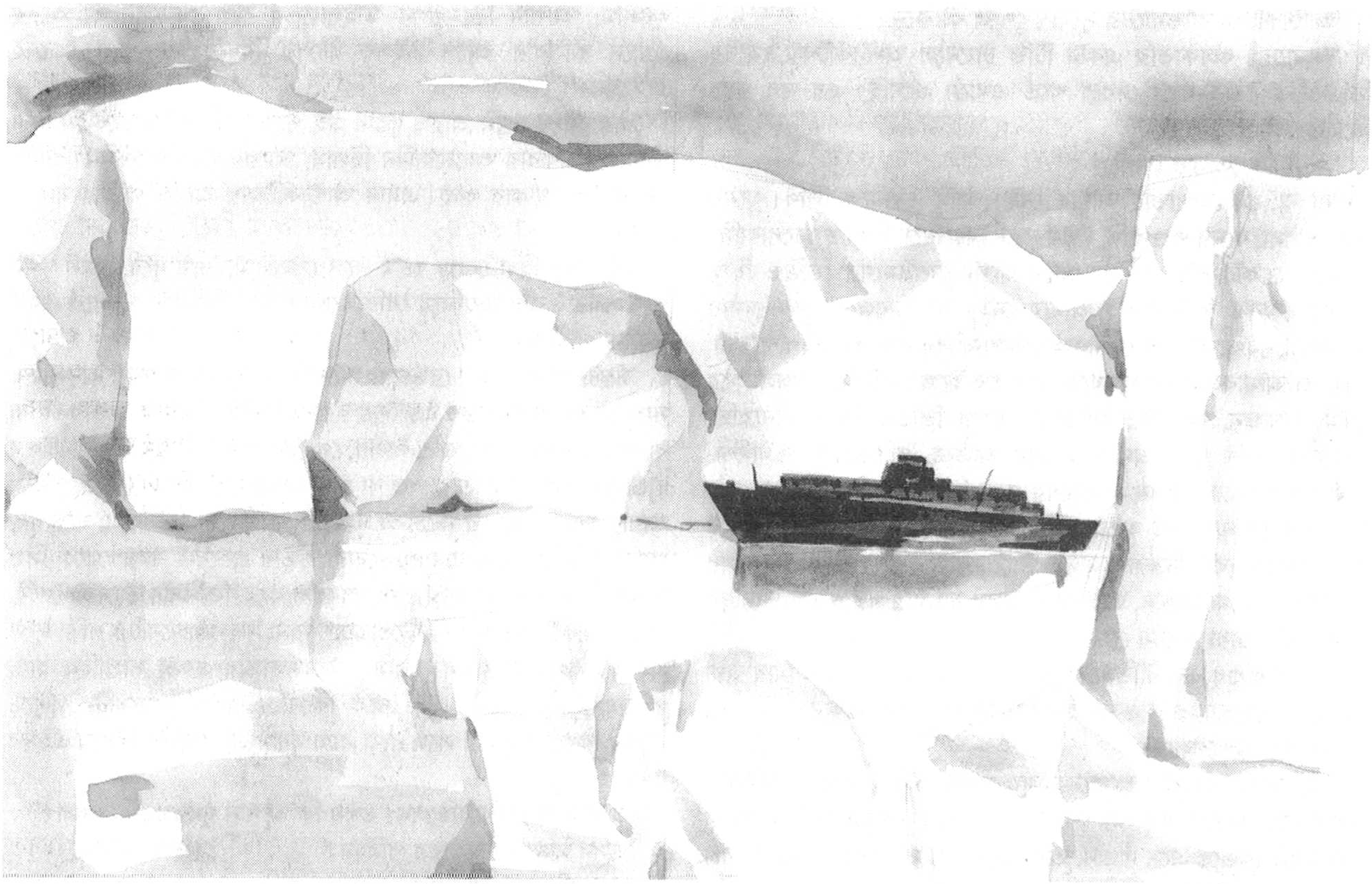
আমি আরও একটু সাহস করে বললাম, ‘আপনি কি এই তুষাররাজ্যে কিছু খুঁজতে এসেছেন?’

সেকথার উত্তর না দিয়ে তিনি সম্পূর্ণ অন্য একটা কথা বললেন, ‘যদি এই অসীম শুভ্রতার রাজ্যে হারিয়ে যাই তাহলে হয়তো আর আমার রাজ্যে ফিরব না। তোমাকে বিশ্বাস করে সব বললাম। আমি জানি তোমাকে বিশ্বাস করা যায়।’

৫

কী একটা উত্তেজনায় বা আশঙ্কায় রাতে ভালো করে ঘুম হল না। পরদিন খুব ভোরে উঠে ক্যামেরা নিয়ে সোজা জাহাজের পাঁচতলায় ছাদে চলে গেলাম। মনে আশা, এখানে ব্রিজ থেকে হয়তো ভোরের মহাসমুদ্রে আশ্চর্য কোনও দৃশ্য দেখা যাবে। ক্যাপ্টেন্স ডেকের মাথায় ছাদের সামনের অংশটাকেই জাহাজের ব্রিজ বলে। শেষ তলার সিঁড়ির শেষ মাথায় উঠে গায়ের জোরে লোহার ভারি দরজা ঠেলে ছাদে পৌঁছেই আচমকা ভয়ে বুকটা ধক করে উঠল, ছাদের ওমাথা থেকে আবছা আলোয় অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তি আমারই দিকে দৌড়ে আসছে।

আরও কাছে আসতে যখন আমার সারা শরীর হঠাৎই ঝিঁঝি ধরার মতো শিরশির করে উঠল ঠিক তখনই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম— ছুটন্ত ছায়ামূর্তি আসলে জাহাজের চিনা রেডিও অফিসার। দিনরাত জাহাজ থেকে পৃথিবীর নানা দেশে বার্তা বিনিময়ের চেষ্টায় একঠাঁই বসে বসে



তাঁর নাকি হাত-পা জমে যায়, তাই রোজ ভোরবেলা পাঁচতলার নির্জন ছাদের চারপাশে কয়েক পাক দৌড়ে নেন।

দূর থেকে ঝাপসামতো বিরাট একটা হিমশৈল ভেসে আসছিল। এতক্ষণে কিছুটা কাছে আসতে চাপা উত্তেজনায় ছাদের রেলিংয়ে ক্যামেরা বসিয়ে ভিউ ফাইন্ডারে চোখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ক্যামেরা-স্ট্যান্ড বা ট্রাইপড তো নেই, ক্যামেরার নড়াচড়া কমাতে তাই কোনও কিছুর ওপর ক্যামেরা রাখবার সুযোগ পেলে তা যতটুকু পারি কাজে লাগাই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিরাট ওই হিমশৈল এত কাছে এসে পড়ল যে ক্যামেরাকে ওইরকম চিন্তাচেতনাহীন একজায়গায় একইভাবে সেঁটে রেখে অবিশ্বাস্য দৃশ্যটিকে তার স্বরূপে পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল।

এবারে ক্যামেরাটা দু-হাতে ধরে, দুই কনুই বুকে চেপে রেখে ভিউ ফাইন্ডারে চোখ লাগিয়ে দমবন্ধ করে যে দৃশ্য দেখছি তাতে যে কারও দমবন্ধ হয়ে আসবে। দমদম থেকে গড়িয়া পর্যন্ত আমাদের গোটা কলকাতা শহরটা সব ঘরবাড়িসুদ্ধু যদি অলৌকিক উপায়ে জমে বরফ হয়ে যায় আর সেটাকে কেউ সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয় তাহলে যেমন দেখাবে এই আইসবার্গটা তেমনই দেখাচ্ছে। তার দেওয়ালে সমুদ্র অবিরাম ঢেউ তুলে আছড়ে পড়ছে। সাদা বরফের গায়ে সাদা ঢেউয়ের আকাশছোঁয়া লম্ফ আমার এই সামান্য হাত-ক্যামেরায় যতটা সম্ভব জুম ইন-আউট করে কখনও ক্লোজ, কখনও লং শটে নিতে পেরে ভারি আনন্দ হল।

রেডিও অফিসার জগিং থামিয়ে একমনে আইসবার্গটা দেখছিলেন, বললেন, 'জানো নিশ্চয়ই, আইসবার্গ জলের ওপরে যতটা দেখা যায় সেটা তার দশভাগের একভাগ মাত্র। পুরো জিনিসটা ওপরে-নীচে এর দশগুণ বড়।'

আইসবার্গ অর্থাৎ হিমশৈল যত এগিয়ে আসছে জাহাজের দুলুনিও তত বাড়ছে। জাহাজ এগোচ্ছে হিমশৈলের দিকে, হিমশৈলও এগিয়ে আসছে জাহাজের দিকে। হিমশৈল যেদিক থেকে আসছে জাহাজও যাচ্ছে সেদিকেই! ফলে জাহাজ থেকে মনে হচ্ছে হিমশৈলই তার গতি বাড়িয়ে চলেছে। যেন হাজার দৈত্য শত শত ফুট লম্বা লক্ষ লক্ষ দাঁত বের করে একজোট হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে মনুষ্যবাহী এই জাহাজের ওপর।

লেন্সের মধ্যে থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না। ভয়ে বুক ধক ধক করছে, আবার মরিয়া হয়ে এও ভাবছি, বাঁচবার কোনও অলীক উপায় নিশ্চয় হবে! সব ছাপিয়ে, এমন দুর্লভ দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করার উল্লাস চাপতে পারছি না।

আইসবার্গটি যখন আরও কাছে এল, তখনই দেখা গেল ওটা জাহাজকে বেশ কয়েক কিলোমিটার বাঁয়ে রেখে এগিয়ে আসছে। মুখোমুখি ধাক্কা লাগার সত্যিই কোনও আশঙ্কা থাকলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই জাহাজের সাইরেন বেজে উঠত। প্রথমদিনই আমাদের বলে দেওয়া হয়েছিল সাইরেন শুনলেই যে যেখানে যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় শুধু লাইফ জ্যাকেট পরে বা পরতে পরতে জাহাজের আপার ডেকে রিসেপশনের সামনে এসে জড়ো হতে হবে।

রেডিও অফিসারও আমাকে কিছু না বলে কখন নেমে গেছেন জানতে পারিনি। বিপদের ভয় থাকলে তিনি আমাকে ফেলে রেখে যেতেন কি?

দূর থেকে আইসবার্গটাকে যতটা বিরাট দেখাচ্ছিল, জাহাজকে অতিক্রম করে চলে যাবার সময় দেখলাম এটা তার চেয়ে বহুগুণ বড়। এ তো শুধু দৈর্ঘ্য-প্রস্থ আর জলের ওপরে থাকা অংশটুকু। পুরোটা সমুদ্রের ওপরে থাকলে তার আয়তন আমার কল্পনায় আসে না।

দিনের শেষে জাহাজের মাইকে ঘোষণা করা হল— দেখুন, দেখুন, সামনেই প্যারাডাইস বে। স্বর্গ বলে যদি সত্যিই কিছু থাকে এ নিশ্চয়ই তাই। উপসাগরের নীল জলরাশির বুকে যেন হাজার হাজার দেবশিশুর অবিরাম হামাগুড়ি আর অবিরল খিলখিল হাসি। এখানকার হিমশৈলগুলোও যেন খেলায় মেতেছে। বাঁয়ে জলতরঙ্গ ফুঁড়ে উঠেছে সুদীর্ঘ হিমবাহ। জমাট বরফ-পাহাড়ের সে এক আশ্চর্য উজ্জ্বলতা। রাত নটায় তার ওপর কমলা রঙের রোদ। শুনলাম একসময় এই প্যারাডাইস উপসাগর তিমি-শিকারিদেরও স্বর্গরাজ্য ছিল।

জাহাজ এখানে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। ছবি তুলতে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে খেয়ালই করিনি সামনে এগোনোর পথ কঠিন বরফে সম্পূর্ণ বন্ধ। মাইকে হোয়েলারের এই ঘোষণা শুনে চেয়ে দেখি আমাদের সামনে, ডাইনে, বাঁয়ে— যতদূর চোখ যায় বরফের পুরু প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে সমুদ্র যেন গুমরাচ্ছে। বরফ-কাটা জাহাজও এখানে অচল। জাহাজের রুশ নাবিক, আমাদের দলপতি আর হিমবাহ বিশেষজ্ঞ ও আন্টার্কটিকার আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা মিলে ঠিক করলেন জাহাজ এপথে আর এগোবার চেষ্টাই করবে না। সেইমতো সারারাত ধরে রুট বদলে ক্রমশ ডানদিকে আমাদের জাহাজ সরতে লাগল।

অ্যাডেলাইড দ্বীপে নামবার চেষ্টা করেও নামা গেল না। যদিও সমুদ্র এখানে কিছুটা কম গভীর কিন্তু ঢেউ সাংঘাতিক। তার ওপর প্রবল হাওয়া।

এর মধ্যে একদিন জাহাজের বোতে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছি, মাঝে মাঝেই সমুদ্রের ঢেউ উঠে এসে হাঁটু অব্দি ভিজিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ একটা উঁচু ঢেউ আমার বাঁদিকের পাঁজরে প্রচণ্ড একটা থাবড়া মেরে আমাকে জাহাজের কাঠের মেঝের ওপর ফেলে দিল। কোনওরকমে ক্যামেরাটা বাঁচালাম বটে, তবে আমার আর ছবি তোলার অবস্থা থাকল না। দেওয়াল ধরে পা টিপে টিপে আমার কেবিন পর্যন্ত এসে দেখি জুতোর দোকানের সেই মেয়েটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

পার্কা-র পকেট থেকে চাবি বের করতেই মেয়েটি আমার অবস্থা দেখে চাবিটা নিয়ে তালা খুলে দরজাটা গায়ের জোরে ঠেলে ধরে বলল, 'এই চিঠিটা নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ো। তারপর চেঞ্জ করে লাইব্রেরিতে গিয়ে কফি আর চকোলেট খেয়ে শরীরের তাপ ফেরাও। সমুদ্রে পড়ে গিয়েছিলে নাকি!'

পার্কা খুলে রেখে মুখবন্ধ খামটা ছিঁড়ে দেখি রাজার দু-লাইন চিঠি বা আদেশনামা, নিজের হাতে ইংরিজিতে লিখেছেন। বাংলায় বললে দাঁড়ায়— তোমার কেবিনে ফিরে আসতে যতই দেরি হয়ে থাকুক, এখনই চলে এসো।

তার মানে রাজা আগেও আমার খোঁজ করেছেন, আমি যে কেবিনে নেই তা জেনেই এই চিরকুট পাঠিয়েছেন।

রাজার কেবিনের কাছে পৌঁছবার আগেই কিছুটা দূর থেকে চোখে পড়ল, দরজার সামনে থেকে বিরাট চেহারার দুটো লোক একটা কুকুরকে চেন ধরে টানতে টানতে নিমেষে উল্টো দিকে দৌড় লাগাল।

এবারও রাজা স্বয়ং দরজা খুলে দিলেন। কিন্তু এবার আমাকে যে ঘরে নিয়ে গেলেন সেটা অন্য একটা ঘর। প্রথমটার মতো এটাও একটা বড় বসবার ঘর। এ ঘরে মস্ত একটা টেবিলের ওপর পাতলা কাগজে আঁকা বিরাট একটা ম্যাপ খোলা আছে। ম্যাপের বাঁদিকে এবং নীচে দুর্বোধ্য অক্ষরে লাইনের পর লাইন কী সব লেখা। লেখাগুলো একটানা নয়, ছোট-বড় নানা ভাগে ভাগ করা।

তাঁর দরজার সামনে থেকে কুকুর নিয়ে লোক-দুটোর কথা শুনে রাজা কিছুমাত্র ব্যস্ত হলেন না, শুধু বললেন, দুজনই সোমালিয়ার মানুষ। শুনেছি একসময় জলদস্যু ছিল, এখন বোধ হয় সমুদ্রে ডাকাতির খুব একটা সুবিধা হচ্ছে না, অন্য কোনও মতলবে আন্টার্কটিকা চলেছে। ক্যাপ্টেন বললেন, ওদের একেকটা কুকুরের জন্য প্রচুর ডলার দিতে হয়েছে, তুমি যা দিয়েছ তার দ্বিগুণ।

মানচিত্রের ওপর ঝুঁকে রাজা একটা বরফের পাহাড়ের চিহ্ন দেখিয়ে বললেন, 'এটা একটা হিমবাহ। এই হিমবাহের গভীরে লম্বা সুড়ঙ্গ আছে, প্রায় তিন কিলোমিটার। তার মধ্যে দিয়েও সমুদ্র বইছে। সুড়ঙ্গের পুবমুখ দিয়ে ঢুকে মাঝামাঝি এগোলে ডানহাতে সমুদ্রজল থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে একটা গহ্বর আছে, সেখানে কী আছে জানো? মধ্যযুগের এক জলদস্যুর সারাজীবনের ধন-সম্পদ। কেউ সেখবর জানে না। হয়তো সোমালীয় দুজন ওই গহ্বরের সন্ধানেই চলেছে। এরকম সুড়ঙ্গওলা হিমবাহ এখানে অসংখ্য। যেমন সুন্দর তেমনই রহস্যময়।'

'আপনি কি গুপ্তধনের টানে এতদূর এসেছেন?'

রাজা এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হেসে বললেন, 'নিজের রাজ্যের ধন-সম্পদ ফেলে এসেছি, এখন দস্যুর ধন-সম্পদ লুট করব? আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। পাবার আশা করি না, যদি পাই, তোমাকে বলেছি না— লোভ লালসা হানাহানির পৃথিবীতে আর ফিরব না।'

রাজা ঠিক কী বলছেন, কী খুঁজছেন আমি কিছুই বুঝতে না পেরে বললাম, 'ঠিক কী খুঁজছেন আপনি? জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদই বা কী? তা কি এই আন্টার্কটিকাতেই পাওয়া যায়?'

আবার তিনি ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়ে তর্জনী দিয়ে কয়েকটা জায়গা দেখিয়ে বললেন, 'এর সবগুলোই একেকটা দ্বীপ। এই দ্বীপগুলো আসলে মাইলের পর মাইল লম্বা, কয়েকশো কিলোমিটার হওয়াও অসম্ভব নয়, চওড়াও তেমনই। এইসব দ্বীপের বিষয়ে এখনও প্রায় কিছুই জানা যায়নি। কিন্তু আমি জানি এইসব তুষারঢাকা দ্বীপে বিরাট বিরাট চোরা খাদ আছে, সেইসব গর্তের মুখ নরম তুষারে ঢাকা। সেটা আন্টার্কটিকার অনেক তুষারক্ষেত্রেই দেখা যায়। কিন্তু এই দ্বীপগুলোর একটা আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য— এর ওপরের তুষারস্তরে খুব সূক্ষ্ম কোটি কোটি ছিদ্র আছে, প্রকৃতির এ এক আশ্চর্য খেয়াল। এরকম একটা দ্বীপই আমি খুঁজছি। দ্বীপ না হয়ে তুষারক্ষেত্রও হতে পারে।'

সংশয়ে আমার মন ছটফট করছে। সেটা না লুকিয়েই বললাম, 'যেসব দ্বীপের কথা কেউ জানে না সেগুলোর বিষয়ে আপনি জানলেন কী করে?'

দুয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে রাজা বললেন, 'আমার দেশে এক বৃদ্ধ ভূগোলবিদ জ্যোতির্বিজ্ঞানী গণিতজ্ঞ আছেন, তিনি পৃথিবী সম্পর্কে এমন আশ্চর্য সব কথা বলে দিতে পারেন যে তুমি একবার শুনলে তাঁর মুখ থেকে খসা প্রত্যেকটি কথার জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করে থাকবে।'

এই সময় হঠাৎই জাহাজ বেশিরকম দুলতে লাগল। রাজার অনুমতি নিয়ে তাঁর ঘরের বাইরে এসে জাহাজের করিডরের দেওয়ালে সাঁটা ফাইবার গ্লাসের জানলা দিয়ে দেখলাম চারদিকে শুধু উত্তাল সমুদ্র। কোনদিকে কোথায় যাচ্ছি তার কোনও হদিশ নেই। জাহাজের ক্যাপ্টেন ও আমাদের এক্সপিডিশন লিডার জানিয়েছিলেন— আলেকজান্ডার দ্বীপের দিকে এগোবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

কয়েকদিন আগেও ড্যাঙ্কো, নেকো হারবার, একদিন কুভেরভিল ও এইরকম আরও কয়েকটি দ্বীপে নেমেছি। সমুদ্রের বুকে জাহাজ দাঁড় করিয়ে জোডিয়াকে চড়ে ওইসব দ্বীপে কয়েকঘণ্টা করে ঘুরেছি। ড্যাঙ্কো দ্বীপে একটা গোটা ক্যাসেটে শুধু হাজার হাজার পেঙ্গুইনের প্রায় যাবতীয় চালচলন তুলেছি। আর এখন এদিকে ঠিক কোথায় চলেছি!

জাহাজের দুলুনি বেড়েই চলেছে। মাইকে বারবার হোয়েলারের সতর্কবার্তা শোনা যাচ্ছে— সকলে যেন কেবিনে ফিরে যান। কেউ যেন কেবিনের বাইরে না থাকেন।

হঠাৎ আমার পিছনেই কেবিনের লোহার ভারি দরজা খোলার আওয়াজে ঘাড় ফেরাতেই রাজা চোখের তীব্র ভাষায় আমাকে ভেতরে আসার ইঙ্গিত করে চাপা মেঘগর্জনে বললেন, 'বৃদ্ধ গণিতজ্ঞ কী বলেছেন জানো? বলেছেন, একদিন মানুষের সংখ্যা এতই বেড়ে যাবে যে পৃথিবীতে সবার আর জায়গা হবে না, অন্য গ্রহে বসবাসের কথা ভাবতে হবে। তারও আগে আমাদের এই পৃথিবী শুধু অসৎ, নির্দয়, লোভী, মিথ্যাচারী মানুষে ভরে যাবে, তখন খাঁটি মানুষ যাঁরা তাঁরা নিজেদের দেশ খুঁজে পাবে স্থলভূমির মানচিত্রের বাইরে মাটির নীচে কোনও অদৃশ্য অঞ্চলে।'

তাঁর গলায় যেমন মেঘগর্জন, চোখেও তেমনই মেঘ ভেঙে ফেটে পড়া আলো। জাহাজ যে এত দুলছে, আমি যে প্রাণপণে মেঝেতে পা সেঁটে

রেখে, দেওয়ালে ভর দিয়ে ছিটকে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচবার চেষ্টা করছি, দৈববাণীর মতো রাজার আশ্চর্য কথাগুলো শুনতে শুনতে সেটা পর্যন্ত খেয়াল করিনি।

এবারও সেই টেবিলজোড়া ম্যাপের ঘরে বসেছি। এর মধ্যেই সেই জুতোর দোকানের মেয়েটি কী করে এই স্যুইট পর্যন্ত এসে মুখবন্ধ পটে কফি দিয়ে গেছে সেদিকে মন দেবারও সুযোগ পাইনি।

এবার একা হোয়েলারের ঘোষণা শোনা গেল— আলেকজান্ডার আইল্যান্ডেও নামা যাবে না। কারণ হিসেবে বলা হল দ্বীপ আমাদের জাহাজ থেকে এখনও ১৬ নটিক্যাল মাইল দূরে (১ 'নট' মানে ১ ঘণ্টায় ১.৮৫ কিলোমিটার গতিবেগ)। অর্থাৎ দ্বীপের কাছাকাছি জাহাজ নিয়ে যেতে আরও ১৬ ঘণ্টা লাগবে। তাছাড়া এখানেও সেই প্রবল হাওয়া। ঘণ্টায় ৮০-৯০ কিলোমিটার বেগে বইছে।

রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে টাল সামলাতে সামলাতে নিজের কেবিনে ফিরে ক্যামেরাটা নিয়ে আরও বিপজ্জনক দুলুনির মধ্যে জাহাজের পিছনের খোলা জায়গাটায় পৌঁছে মনে হল চোখের পলকে শরীরের সব তাপ বেরিয়ে যাচ্ছে! হাওয়ার গতিও নিশ্চয়ই আরও বেড়েছে, সমুদ্র জুড়ে শুধু ঝড়ের তাণ্ডব। প্রচণ্ড শব্দে কানের পর্দা মনে হয় ফেটে যাচ্ছে, ভয়াবহ হাওয়া যেন নাক-মুখ চেপে ধরেছে, নিশ্বাস নেওয়াই যাচ্ছে না। শরীর ঝাঁকিয়ে প্রচণ্ড কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল। অসাড় আঙুলেই পার্কা-র পকেট থেকে বের করে গোমুখের সাধুর দেওয়া ওষুধ তিন ফোঁটা জিভে ফেলতেই একটু যেন কাঁপুনি কমল।

হাতে-পায়ে জোর নেই। করিডরে ফেরার দরজাটা ঠেলে খুলতেও কয়েকবার চেষ্টা করতে হল। প্রতিবারের চেষ্টায় একটুখানি ফাঁক হয়েই আবার দড়াম করে বন্ধ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে প্রায় ছিটকে এসে ভেতরে পড়লাম। বুকভরে নিশ্বাস নিয়ে শরীরের শক্তি কিছুটা ফিরে পেতেও অনেকটা সময় লেগে গেল।

আমরা কোনদিকে যাচ্ছি? কতদিন ধরে জাহাজ শুধু চলেছে তো চলেছেই। ছ-সপ্তাহের আর ক-সপ্তাহই বা বাকি আছে? জাহাজ কি তবে দিশাহারা?

মনের উদ্বেগ সত্ত্বেও যেই মনে পড়ছে আজ ১৪ ডিসেম্বর তখনই অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে। ১৯১১ সালে এই দিনটিতেই কুকুরে-টানা স্লেজগাড়িতে দক্ষিণমেরুতে পৌঁছেছিলেন রোয়াল্ড আমুন্ডসেন। যদিও এর বহু আগেই ১৯০২ সালের ডিসেম্বর মাসে রবার্ট স্কট, এডওয়ার্ড উইলসন আর আর্নেস্ট শ্যাকল্টন ৮২ ডিগ্রি ১৬ মিনিট দক্ষিণ পর্যন্ত পৌঁছেও প্রয়োজনীয় খাবারের অভাবে আর সীমাহীন সাংঘাতিক তুষারে প্রায় অন্ধ হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। শ্যাকল্টন অবশ্য এর ছ-বছর পরই ১৯০৮-এর ১লা জানুয়ারি দক্ষিণমেরুর ৯৭ মাইলের মধ্যে যেতে পেরেছিলেন। আর অ্যামুন্ডসেনের দক্ষিণমেরুতে প্রথম পদার্পণের মাত্র মাসদেড়েক আগেও স্কট তাঁর চার সহ-অভিযাত্রীর সঙ্গে সবার আগে দক্ষিণমেরু ছোঁয়ার লক্ষ্যে শেষ পর্যন্ত রওনা হয়েও স্লেজ টানার কুকুরের অভাবে ব্যর্থ হন। কুকুর না পেয়ে তাঁরা নিজেরাই পালা করে স্লেজ টানতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাতেই লক্ষ্যে পৌঁছতে দেরি হয়ে যায়। যখন পৌঁছলেন দেখলেন আমুন্ডসেন আগেই সেখানে পৌঁছে গেছেন। স্কটের সঙ্গীরা কেউই আর ফিরে আসতে পারেননি। একটার পর একটা ভয়াবহ ঝড়ঝঞ্ঝায় পড়ে, অনাহারে, আত্মরক্ষার অব্যবস্থায় তিনিও পথেই মারা যান। তাঁর মৃতদেহের পাশেই তাঁর রোজকার অভিজ্ঞতার পুঙ্খানুপুঙ্খ দিনপঞ্জিটি পাওয়া গেছে, দক্ষিণমেরু অভিযান আর ওই শ্বেতমহাদেশ বিষয়ে সে নাকি এক মূল্যবান ভাণ্ডার।

সেই ১৪ই ডিসেম্বর, সেই আন্টার্কটিকায়, সেই দক্ষিণমেরু প্রদেশে আমি! ঠিক যে আমরা জাহাজের আশ্রয়ে আছি, জাহাজ যতটা এসেছে, কুমেরু বা দক্ষিণমেরু তার থেকে অনেক দূরে। হয়তো দেড়-দুহাজার কিলোমিটার দূরে, তবু তো দক্ষিণমেরুবৃত্তের বেশ খানিকটা ভেতরে এসে গেছি। এই বৃত্তের ঠিক মধ্যবিন্দুই তো দক্ষিণমেরু।

ওদিকে দানব ঝড়ের হাড় হিম করা দাপাদাপি চলছে তো চলছেই।

এর মধ্যেই জাহাজে যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটল। পুরো জাহাজটা প্রবল একটা ঝাঁকুনি খেয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল। হয়তো দু-পাঁচশো ফুট দূরে ছিটকেও গেল।

আসলে জাহাজ কখন সমুদ্র ফুঁড়ে ওঠা দুপাশের বিরাট বিরাট হিমবাহের মধ্যে দিয়ে একটা চ্যানেল ধরে চলতে শুরু করেছে আমি জানতাম না। যাত্রীদের কেউই হয়তো জানতেন না। এরকম একটা হিমবাহ হঠাৎই ভেঙে গিয়ে জাহাজ ঘেঁসে সমুদ্রে এসে পড়েছে। ভাঙা অংশটাই শোনা গেল পনেরো-কুড়ি মাইলের কম নয়।

জাহাজের চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে ক্যাপ্টেনের ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠতে দেখে আমি জিজ্ঞেস করে জানলাম, ভাগ্যক্রমে জাহাজ বেঁচে গেলেও নেভিগেশন রুমের যন্ত্রপাতি ভালোই জখম হয়েছে। ঝড় তো নয়, মনে হয় লক্ষ লক্ষ দৈত্য যেন হুংকার করে তেড়ে আসছে।

হঠাৎ হোয়েলারের ঘোষণা— প্রত্যেকে লাইফ জ্যাকেট পরে রিসেপশনে চলে আসুন!

তবে কি সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে? বড় কোনও বিপদে পড়েছি আমরা? ঝড়ের হানায় বা ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজ তার নির্দিষ্ট যাত্রাপথ থেকে অন্যদিকে সরে গেছে? জাহাজের বিভিন্ন কম্পাস রেডার ইত্যাদি কাজ করছে তো?

৬

রিসেপশনে অনেকেই পৌঁছে গেছেন। জাহাজের চিফইঞ্জিনিয়ার ও সামুদ্রিক হাওয়া ও ঢেউ বিশেষজ্ঞকে পাশে নিয়ে হোয়েলার সবাইকে কী একটা বোঝাচ্ছেন। দেখলাম সকলেই বন্ধ দরজার স্বচ্ছ জানলার সামনে ভিড় করে বাইরে কিছু দেখবার চেষ্টা করছেন।

কয়েক মুহূর্তের জন্য সুযোগ পেয়ে আমি যা দেখলাম তাতে অজানা আশঙ্কায় দমবন্ধ হয়ে আসে। হিমবাহঘেরা চ্যানেল থেকে বেরিয়ে এসে আবার নতুন বিপদ! জানলা দিয়ে দেখলাম যেন একটা বিরাট বরফের দুর্গ ভেসে চলেছে। কুড়ি-পঁচিশতলা বাড়ির মতো উঁচু, লম্বায় অন্তত কয়েকশো কিলোমিটার। চওড়াও কুড়ি-পঁচিশ কিলোমিটারের কম নয়। বিশাল এই হিমশৈলের সামনে ও যে-পাশটা জাহাজের দিকে, সেই দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের দু-দিকই মস্তবড় একটা কফিন বা ডিভানের মতো মসৃণ, মাথাটাও কফিন বা ডিভানেরই মতো চাঁচাছোলা। যেন শ্বেতপাথরের একটা বিশাল চলমান উঁচু মাঠ। আমাদের পিছন থেকে এসে জাহাজটাকে দ্রুত অতিক্রম করে ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে।

জাহাজের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ও রেডার দেখে যাঁরা কোনও দ্বীপের অস্তিত্ব আগাম টের পান তাঁদের একজন প্রায় দৌড়ে এসে হোয়েলারের হাতে একটা বড় কাগজ দিলেন। হোয়েলার তাতে চোখ বুলিয়ে দুয়েক মুহূর্ত আমাদের দেখে নিয়ে বললেন, 'এতক্ষণে আলেকজান্ডার আইল্যান্ড এসে যাবার কথা ছিল। অথচ জাহাজের রেডারে ওই দ্বীপটার কোনও চিহ্নই ধরা পড়ছে না। ক্যাপ্টেন জানাচ্ছেন যে-অফিসাররা রেডারে চোখ রেখে বসে আছেন, তাঁদের কাছে সবচেয়ে আগে যে দ্বীপের অস্তিত্ব ধরা পড়বে জাহাজ এবার সেখানেই থামানো হবে, সেই দ্বীপেই আমরা নামব।'

ঝড় ও দুলুনির বিরাম নেই। বমি ধরার পলিথিন-প্যাকেট নিয়ে জাহাজের কেবিন-বয়দের ঘোরারও বিরতি নেই। কয়েকজন যাত্রী তখন-তখনই তার সদ্ব্যবহার করলেন, কেউ কেউ আবার আগাম সংগ্রহ করে রাখলেন। জাহাজ এত বেশি দুলছে যে কিছু না ধরে দাঁড়িয়ে থাকাই অসম্ভব। ধরবার মতো দেওয়াল বা ধাতুর স্তম্ভ বা কাউন্টার না পেয়ে একজন আরেকজনকে ধরে টাল সামলাবার চেষ্টা করছে। তবে লাইফ জ্যাকেট কেন পরে আসতে বলা হয়েছিল বোঝা গেল না।



উপস্থিত যাত্রীদের মধ্যে সেই রহস্যময় রাজাকে দেখতে পেলাম না।

বিনা আহ্বানে তাঁর স্যুইটের দরজায় ঠকঠক করা ঠিক হবে কিনা তা নিয়ে মনে দ্বিধাসত্ত্বেও ডাইনে-বাঁয়ে দেওয়াল ধরে জাহাজের দুলুনির সঙ্গে প্রায় কুস্তি লড়তে লড়তে শেষ পর্যন্ত তাঁর স্যুইটের সামনে এসে হাজির হলাম। লোহার ভারি দরজা, কড়া নেই, ঘণ্টিও বাজছে কিনা বোঝা গেল না, অগত্যা হাতের মুঠো দিয়ে ঘা দিতে লাগলাম।

দরজা খোলার কোনও লক্ষণ নেই। আমার মুঠোর ঘা হয়তো ভেতরে শোনাই যাচ্ছে না, অথবা রাজা নিদ্রিত, কিংবা স্নানঘরে।

শরীর যখন ভেঙে পড়ে তখন মানুষের মস্তিষ্কও বোধহয় শিথিল হয়ে যায়। এতক্ষণ দুলুনির সঙ্গে লড়াইয়ে কাহিল হয়ে পড়েছিলাম, এখনই আবার একইভাবে এতটা পথ পার হয়ে নিজের কেবিনে ফেরার কথা ভাবতে পারছি না। অগত্যা আগুপিছু না ভেবে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলাম— ইয়োর এক্সসেলেন্সি! ইয়োর এক্সসেলেন্সি!

কোনও সাড়া নেই। অথচ দাঁড়িয়েও থাকতে পারছি না, দরজার সামনেই বসে পড়লাম।

বেশ খানিকক্ষণ পর দরজা খুলে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে দেখি রাজার চোখ যেন জ্বলছে। শুধু বললেন, 'ভেতরে এসো।'

এবারও সেই যে-স্যুইটে ড্রয়িংরুমের বিরাট টেবিলে মানচিত্র মেলে রাখা আছে সেই ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে এবার নতুন যেটা দেখলাম তা হল তাঁর সেই অদ্ভুত যন্ত্রটা একপাশে মেঝের কার্পেট সরিয়ে সরাসরি কাঠের ওপর বসানো। যন্ত্রটার বিভিন্ন মিটারে নানা আকারের কাঁটাগুলো ডাইনে-বাঁয়ে, ওপর-নীচে যেন ছটফট করছে। কখনও একটা, কখনও দুটো, কখনও অনেকগুলো একসঙ্গে, কখনও খুব দ্রুত, কখনও কিছুটা ধীরে।

রাজা একবার কাঁটাগুলোর নড়াচড়া, একবার মানচিত্র গভীর দৃষ্টিতে দেখছেন। তাঁর ভ্রূ কোঁচকানো, কপালে গভীর ভাঁজ।

মেঝের সঙ্গে নাট-বোল্ট দিয়ে আটকানো একটা মোড়ায় বসেও আমি ঠিকমতো টাল সামলাতে পারছি না, রাজা কী করে কখনও কোমর ভেঙে যন্ত্রের ওপর ঝুঁকে পড়ছেন, কখনও সোজা হয়ে মানচিত্রে চোখ রাখছেন ভেবে পাই না। টেবিলটা মেঝের সঙ্গে নাট-বোল্ট দিয়ে আটকানো না হলে সেটা এতক্ষণ ভূতুড়ে টেবিলের মতো এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াত বা দৈত্যনাচ শুরু করে দিত।

রাজা হঠাৎ আমার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'দ্বীপে নামবার সময় তুমি কী কী সঙ্গে নাও?'

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন? একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'ক্যামেরা, একটা এক্সট্রা ব্যাটারি, একটা খালি ক্যাসেট আর আমার পাসপোর্ট আর বিমানের টিকিট। আর মারাত্মক ঠান্ডায় রক্ত জমে গিয়ে যাতে হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে না যায় তার একটা প্রাকৃতিক ওষুধ, হিমালয়ের এক সাধু আমাকে দিয়েছিলেন।'

রাজা এবার আমাকে নিয়ে পাশের স্যুইটে এলেন। হুবহু একইরকম বড় বসবার ঘর।

আমি বললাম, 'আপনি কি রিসেপশনে গিয়েছিলেন? হোয়েলার জানালেন, আলেকজান্ডার দ্বীপের হদিশ রেডার থেকে হারিয়ে গেছে। এরপর রেডারে যে দ্বীপের অস্তিত্ব দেখা যাবে'—

রাজা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'হোয়েলার আমাকে স্যুইটে ফোন করে সব বলেছেন। তিনি কি জানেন না যে আগামী দুদিনের মধ্যে কোনও দ্বীপের হদিশই জাহাজের রেডারে ধরা পড়বে না? তার প্রথম কারণ, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই পথে কোনও দ্বীপ পড়বে না, দ্বিতীয় কারণ রেডার এখনই ঠিকমতো কাজ করছে না। তাছাড়া, ভাঙা হিমবাহের ধাক্কায় নেভিগেশন অফিসাররাও হয়তো চৌম্বক দক্ষিণমেরুর নিত্যপরিবর্তমান অবস্থানের হিসেব করে কম্পাসের দিকনির্দেশ নির্ভুলভাবে বুঝতে পারবেন না।'

তিনি চুপ করে গেলেন। গভীরভাবে কিছু ভাবছেন। তাঁর চোখের তীব্র উজ্জ্বলতা আমার নজর এড়াল না।

তিনি আবার শুরু করলেন, 'হাওয়ার ধাক্কায়, যান্ত্রিক গোলযোগে জাহাজ এখন কোনদিকে যায়, কোন দ্বীপে তুমি নামবে তা কেবল আমার দেশের ভূগোলবিদ গণিতদেবই বলতে পারেন। ইংরিজিতে 'গড অব ম্যাথমেটিক্স' এই প্রথম বললেন। কথাটা বলেই তিনি আমার মুখের ভাব যেন জরিপ করতে লাগলেন।

'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, ফেলো এক্সপিডিশনার্স!' আবার মাইকে হোয়েলার কিছু ঘোষণা করছেন, 'দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আজ উনত্রিশ দিন হল আমরা সমুদ্রে রয়েছি, পূর্বনির্ধারিত যাত্রাসূচি অনুযায়ী ইতিমধ্যেই আমাদের ফিরতি যাত্রা শুরু করার কথা। কিন্তু তীব্র হাওয়া আর প্রবল ঢেউয়ের কারণে জাহাজ নির্ধারিত যাত্রাপথ থেকে অনেকটা সরে এসেছে। একই কারণে এখনই ফেরার পথ ধরা সম্ভব হচ্ছে না।'

মনে হয় যাত্রীদের প্রতিক্রিয়া বা পুরো পরিস্থিতিটা বোঝবার জন্য একটু বিরতি নিয়ে আবার শুরু করলেন— 'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন! আপনারা ভীত হবেন না। আমরা আপনাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে দুর্লভ অভিজ্ঞতার অংশীদার করে সম্পূর্ণ নিরাপদে উশুয়াইয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব। আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা জাহাজে প্রয়োজনীয় মেরামতির কাজে ও রেডিও অফিসাররা বাইরের জগতের সঙ্গে বার্তা-বিনিময়ে সদা নিয়োজিত। শুধু ছোট্ট একটা ব্যাপারে আপনাদের সহযোগিতা চাই। যেহেতু আমরা এই আশ্চর্য সুন্দর অভিযান নির্ধারিত ছ-সপ্তাহের মধ্যে শেষ করতে পারছি না, তাই সকলকে অনুরোধ কেউ কোনওরকম খাবার অপচয় করবেন না, আমাদের সকলকেই যতটা

সম্ভব কম করে খেতে হবে। পানীয় জলের ব্যাপারেও একই অনুরোধ। প্লিজ, বেয়ার উইথ আস। দয়া করে এটুকু সহ্য করুন।'

৭

পরদিন সকাল থেকে ঝড়ের দাপট কমতে লাগল, কিন্তু হিমশৈলের সংখ্যা বাড়তে লাগল। সেদিনই মাঝরাতে শুরু হল তুষারঝড়। কখনও বাড়ে, কখনও কিছুটা কমে।

সকালে, দুপুরে, রাতে খাবার ঘরে হইচই হাসি গল্প আর শোনাই যায় না। সকলেরই মনে উদ্বেগ, মুখে শঙ্কার ছায়া।

এরই মধ্যে হঠাৎ খাবার টেবিলেই মাথা ঘুরে চেয়ার থেকে মেঝেয় একজন পড়ে গেলেন, তিনি এসেছেন জর্ডন থেকে। মুখ দেখেই চিনতে পারলাম, প্রথমদিন খাবার টেবিলে মজা করে বলেছিলেন— আমার দেশের ডেড সি-র নোনা জল চেখেছি, এবার চাখব আইসবার্গের মিঠে জল।

জাহাজের কর্মীরাই ধরাধরি করে তাঁকে তাঁর কেবিনে নিয়ে শুইয়ে দিলেন। জাহাজের আইরিশ ডাক্তার ওষুধপত্রও দিলেন, সেইসঙ্গে বিধান দিলেন যে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁকে সবসময়ই শয্যাশায়ী থাকতে হবে।

এরও একদিন পর দূর থেকে খালি চোখেই ঝাপসামতো একটা বরফে ঢাকা দ্বীপ দেখা গেল। দ্বীপটার নাম কী, আমরা কত অক্ষাংশ, কত দ্রাঘিমাংশে আছি, এসব বিষয়ে জাহাজের ক্যাপ্টেন, এক্সপিডিশন লিডার, চিফ অফিসার বা ইঞ্জিনিয়ার কেউই আমাদের কিছু ভেঙে বলছেন না। বরং মনে হয় সবাই কিছু একটা লুকোচ্ছেন।

কয়েক ঘণ্টা পর জাহাজ স্থির হয়ে দাঁড়াল। আরও আধঘণ্টা পর দ্বীপে যাবার জন্য সিঁড়ির মুখে পৌঁছবার ঠিক আগে দরজা-বন্ধ যে ঘরে নাম সই করতে হয় সেখানে সই করে কিউয়ে দাঁড়াতে বলা হল।

একটার ওপর একটা গলা অব্দি গরম পোশাক, পায়ে দু-প্রস্থ মোজা, হাতে দু-প্রস্থ দস্তানা, মুখ-মাথা ঢাকা টুপি পরে তৈরি হয়ে নাম লেখার ঘরে লাইনে দাঁড়াতে গিয়ে দেখি সবার আগে রাজা দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে সেই বড় ব্যাগটা। আমাকে দেখেই কাছে ডেকে নিলেন ও তাঁর পিছনের জাপানি ছেলেটাকে কী একটা বলে তার জায়গায় আমাকে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

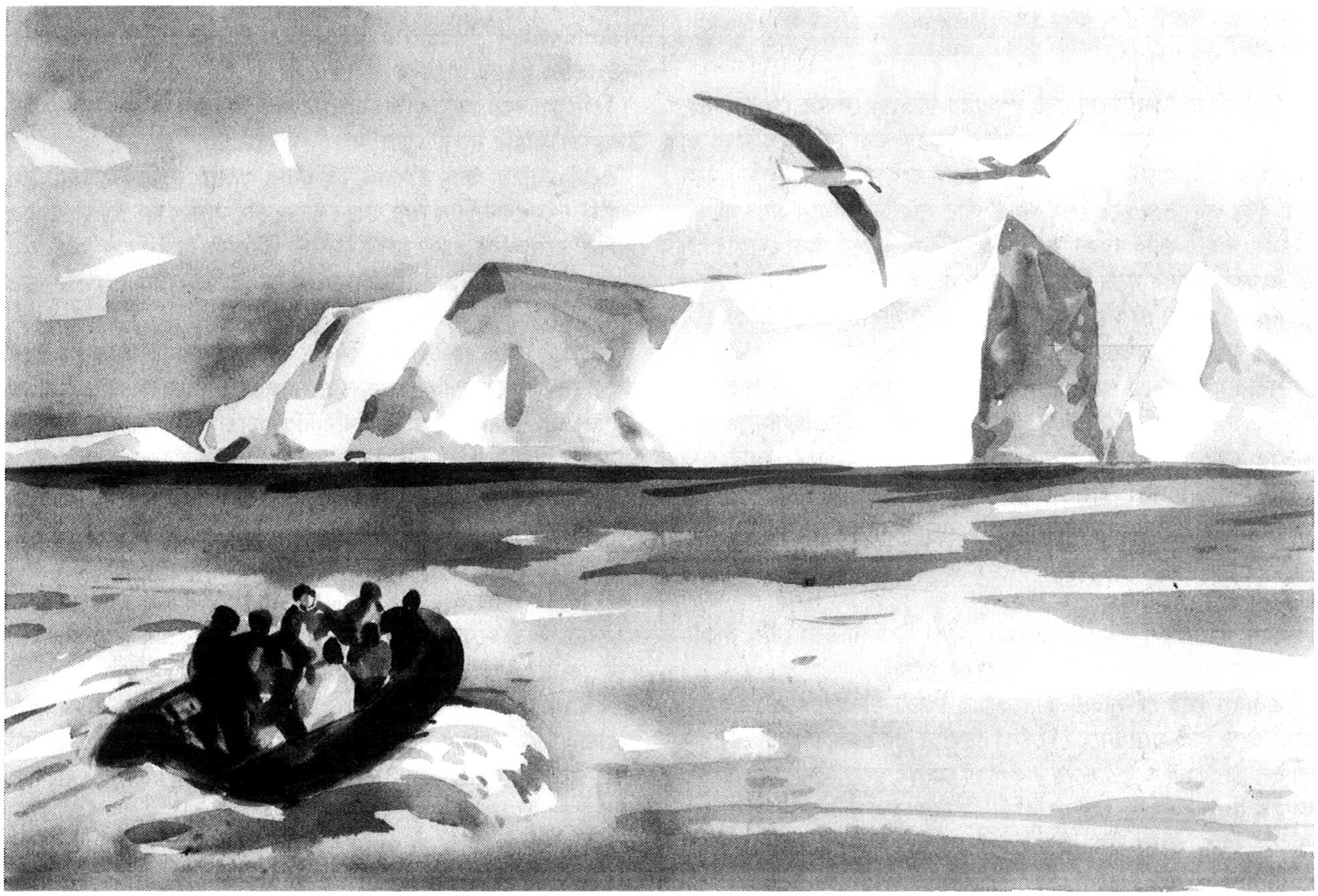
সিঁড়ির দরজা এখনও খোলেনি। রাজা গলা নামিয়ে আমাকে বললেন, 'আজ প্রথম জোডিয়াকটায় যেতে হবে, ফিরবও একেবারে শেষটায়। এই দ্বীপে যত বেশি সময় পাওয়া যায় ততই ভালো।'

একটু পরেই দরজার সামনে দাঁড়ানো কর্মী-দুজন গায়ের জোরে ঠেলে ভারি দরজাটা খুলে ধরতেই আমরা দুজন বেরিয়ে এসে সিঁড়ির মুখে দাঁড়ালাম। আমাদের পিছনে পিছনে আরও চারজন বেরিয়ে এলেন। জাহাজের গায়ে লাগানো নড়বড়ে অস্থায়ী সিঁড়ি বেয়ে একে একে ছজনই নেমে এসে প্রথম জোডিয়াকটায় উঠে বসলাম। সিঁড়ির শেষ ধাপের গায়ে লাগানো পাটাতনে যে দুজন কর্মী যাত্রীদের সব কিছু নিয়মমাফিক আছে কিনা দেখেন, রাজার বড় ব্যাগটা দেখে আজ আর কিছু বললেন না, শুধু সম্মতিসূচক মুচকি হাসলেন।

ঝাঁকুনি দিয়ে জোডিয়াক ছাড়তেই আমি ডানহাতের চামড়ার দস্তানা খুলে পার্কা-র ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বুকের কাছ থেকে ক্যামেরাটা বের করলাম। চামড়ার দস্তানায় হাত ঢাকা থাকলে জুম-ইন জুম-আউট করাই যায় না, ক্যামেরা অন-অফ করাও কঠিন।

দ্বীপ এখনও বেশ দূরে। লং শটে সমুদ্রের বুকে পুরো দ্বীপটা ধরব বলে ক্যামেরা নিয়ে তৈরি হয়ে ছোট ছোট হিমশৈলের ধাক্কা সামলাচ্ছি, ডানহাতের পাতা ও পাঁচ আঙুল কেউ যেন পাথরছ্যাঁচা করছে।

রাজা চোখে দূরবিন লাগিয়ে হয়তো দ্বীপটাকেই দেখবার চেষ্টা



করছেন।

আরও কিছুক্ষণ পর পুরো দ্বীপ আমার ক্যামেরার ফ্রেমে ধরা দিল। ক্রমশ দ্বীপটা বড় হতে লাগল। সমুদ্র জুড়ে বিরাট একফালি বরফের মতো দেখাচ্ছে। দ্বীপটার নাম কী? জোডিয়াক-চালকও এ দ্বীপের নাম বলতে পারল না বা বলতে চাইল না।

জোডিয়াক থেকে যেখানে নামতে হল সেখানে জল এক ফুটের বেশি নয়। প্রত্যেকের পায়ে হাঁটু অব্দি রবারের জুতো, পা ভেজবার ভয় নেই। দ্বীপটাও জল থেকে বেশ উঁচু, ক্রমশ ঢালু হয়ে পাহাড়ের মতো আকার নিয়েছে। দ্বীপের বুকে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে ছোট-বড় আরও অনেক তুষারের স্তূপ। প্রথম দর্শনেই আমার মনে হল যেন সাদা মেঘের পাল মর্ত্যে নেমে এসেছে।

কিছুটা কসরত করে দ্বীপের কিনার আঁকড়ে বরফের ওপর হাঁটুর ভর দিয়ে দ্বীপে উঠে গেলাম। রাজা জলে দাঁড়িয়েই এক হাতে হোয়েলারের বাড়ানো হাত ধরে বেশ সহজে উঠে এলেন।

'সবসময় আমাকে অনুসরণ করো' বলে তিনি হনহন করে দ্বীপের ভেতরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

দ্বীপটা মনে হয় খুবই বড়। মাঝে মাঝে তুষারের বুকে নীল জলের অপূর্ব সব হ্রদ। প্রত্যেকটা হ্রদের আকার ও আয়তন আলাদা। একটার সঙ্গে আরেকটার জলের গাঢ় নীল রং ছাড়া আর কোনও মিল নেই। প্রত্যেকটা হ্রদই এত সুন্দর যে ফেলে এগিয়ে যেতে কষ্ট হয়। তার চেয়েও কষ্ট— ছবি তুলতে হচ্ছে তাড়াহুড়ো করে। কোথাও সময় নিয়ে ক্যামেরা প্যান করতে গেলে বা ঢালুর দিকে উঠে ক্যামেরার চলন ভাবতে চাইলে রাজা পিছন ফিরে হাতের ইঙ্গিতে তাঁকে অনুসরণ করতে বলেন। এক জায়গায় হ্রদের বুক ফুঁড়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে বৃত্তের আকারে জল তীব্র বেগে ঘুরতে ঘুরতে অবিরাম নেমে যাচ্ছে দেখে ক্যামেরা ফুল জুম থেকে খুব ধীরে ধীরে জুম-আউট করতে খানিকটা সময় লেগে গেল। ক্যামেরা থেকে চোখ তুলতেই দেখি হ্রদের তীরে রাজা তাঁর সেই অদ্ভুত যন্ত্রটি বসিয়ে তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন।

হ্রদটা এতই বড় যে মনে হয় এই দ্বীপটা যেন একটামাত্র দ্বীপ নয়, হ্রদের দু-তীরে দুটো আলাদা দ্বীপ।

টলটলে নীল জলের ছোট-বড় হ্রদ এখানে অনেকগুলো, আমিই সতেরোটা গুনেছি। তার চেয়েও অবাক হয়েছি হ্রদগুলোর আলাদা আলাদা আকার দেখে। কোনওটা পূর্ণিমার চাঁদের মতো গোল, কোনওটা আবার বরফে বুক চেপে শুয়ে থাকা পেঙ্গুইনের মতো। ছোট্ট একটা হ্রদ দেখলাম, একেবারে পদ্মপাতার আকার। একটা হ্রদ দেখতে দেখতে পাড়ের নরম তুষারে আমার পা গেঁথে গেল— হুবহু মানুষের চোখের মতো গড়ন! নীল জলে টলটল করছে।

এরকম সাংঘাতিক শীতে, তাপমাত্রা যেখানে হিমাঙ্কের এত নীচে সেখানে হ্রদের জল জমে বরফ না হয়ে কী করে এমন টলটল করছে সে-ও ভারি আশ্চর্যের। তিনটে হ্রদ ছুঁয়ে দেখেছি— জল ঠান্ডাও না, চমৎকার উষ্ণ। আরেকটা হ্রদ তো রীতিমতো গরম জলের, হ্রদের বুক থেকে ধোঁয়া বেরচ্ছে।

এখানে সাতদিন বা একমাস থেকে সারাদিন সারারাত ক্যামেরা নিয়ে ঘুরতে পারলে কী আশ্চর্য একটা প্রকৃতির রূপ দেশে ফিরে সবাইকে দেখাতে পারতাম! এটা ভেবেই এই ভয়ানক ঠান্ডার মধ্যেও মনে শিহরন জাগে।

এই দ্বীপে আমাদের বরাদ্দ সময় তিনঘণ্টা। এর আগে কোনও দ্বীপেই এরকম হ্রদও দেখিনি, এত দীর্ঘ সময়ও থাকতে দেওয়া হয়নি। হয়তো জাহাজে কিছু জটিল মেরামতির কাজ করা হচ্ছে।

হাতে এখনও দেড়ঘণ্টা আছে। দেড়ঘণ্টায় যতটুকু দেখেছি তাতেই বোঝা যায়, এর আগের দেখা সবচেয়ে বড় দ্বীপের চেয়েও এই দ্বীপটা বেশ কয়েক গুণ বড়।

রাজা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন, আমি সাবধানে তাঁর পায়ের চাপে তৈরি হওয়া গর্তে পা ফেলে ফেলে এগোচ্ছি যাতে নরম তুষারস্তরের নীচে কোনও চোরা খাদে পা পড়ে তলিয়ে না যাই। তার মধ্যেই কোথাও দাঁড়িয়ে পড়ে ছবি তুলছি, যেখানে পারছি পকেট থেকে স্টিল ক্যামেরা বের করে দুয়েকটা স্থিরচিত্রও তুলে নিচ্ছি, হঠাৎই সহস্র দৈত্যের শিস শুনে চমকে গিয়ে দেখি বহুদূর থেকে কোটি কোটি টন সাদা গুঁড়ো প্রবল বেগে ধেয়ে আসছে। কয়েক মুহূর্তেই সেই সাদা গুঁড়ো আমার জুতো, প্যান্ট, পার্কা, ক্যামেরা, কালো চশমার রং মুছে সব সাদা করে দিল। ঠান্ডাও আরও ভয়ানক হয়ে উঠল। আমি এরকম আকস্মিক আক্রমণে প্রথমটা একেবারে বোধ-বুদ্ধিহীন হয়ে পড়লাম। পরে যখন বুঝলাম যে এ সেই মারাত্মক তুষারঝড়, তখন ভয় এসে মনকে আচ্ছন্ন করল।

এই সংখ্যার ৮ নতুন পর্ব

রাজা কোথায়, কতদূরে জানি না। তাঁর পায়ের চিহ্নও বরফে ঢেকে গেছে। আমাদের দলেরও কেউ এদিকে এত দূরে আসেনি। অসীম এই তুষাররাজ্যে আমি এখন একেবারে একা। যেখান থেকে দ্বীপে উঠেছি সেখানে ফিরে যাবার রাস্তাও যেন মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে। অতিবেগুনি রশ্মি আটকানো চশমার কালো কাচ থেকে দস্তানা ঢাকা হাতে বহু কষ্টে যতবারই তুষার মুছে ফেলি, ততবারই আবার চশমা তুষারে ঢেকে যায়। এরই মধ্যে যতক্ষণ পারলাম, দুহাতে ক্যামেরা উঁচু করে তুষারের ঝাপটা বাঁচিয়ে লেন্স নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে ধরে যতটা পারলাম প্রবল তুষারঝড়ের কিছুটা তুলে নিলাম।

এই ঠান্ডা, এই তুষারপ্রবাহ আর সহ্য হচ্ছে না।

পৃথিবীর ঠিক কোথায় আছি জানি না, এই নিষ্ঠুর তুষাররাজ্যের সীমা কোথায় কোনদিকে সে বিষয়ে কোনও জ্ঞান নেই, দলের কেউ বা দলনেতা এসে আমাকে খুঁজে বের করবেন সে ভরসাও ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। তুষারের চাদরে আমার সারা শরীর ঢেকে গিয়ে আমি নিশ্চয়ই এতক্ষণে তুষারস্রোতের মধ্যে তুষারমূর্তি হয়ে গেছি। রাজা যদি আমাকে দেখতে না পেয়ে এদিকে ফিরেও আসেন, আমাকে খুঁজে পাবেন কী করে!

তুষারঝড় বেড়েই চলেছে। এরকম চলতে থাকলে আমি তো তুষারে ঢাকা পড়ে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যাব! বাঁচবার সব আশা তবে শেষ হয়ে আসছে! হঠাৎ একটা অদ্ভুত সুগন্ধ নাকে এসে লাগল। ঝোড়ো হাওয়াই বয়ে এনেছে। গন্ধটা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। আরও একটা ব্যাপার লক্ষ করে আমার বিস্ময়ের আর সীমা নেই। গন্ধ যত বাড়ছে ততই যেন আমার শীতের তীব্রতাও কম বোধ হচ্ছে। মনে হয় যেন মৃত্যুর আলিঙ্গন থেকে বেরিয়ে আসছি। গোমুখের সাধুর দেওয়া ওষুধটার কথাও আমার মনে পড়ে গেল। বহু কসরত করে পার্কা-র ভেতরের পকেট থেকে শিশিটা বের করে যতই জিবের ওপর ফোঁটা ফেলতে যাই, ঝড়ের হাওয়ায় তা উড়ে মুখের বাইরে গিয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তুষারপ্রবাহের দিকে পিছন ফিরে কোনওরকমে জিবে সরাসরি তিন ফোঁটা ওষুধ ফেলতে সক্ষম হলাম।

সুগন্ধ আর এই সন্ন্যাসীর ওষুধ আমাকে এবার প্রাণ ফিরিয়ে দিচ্ছে মনে হল।



খালি চোখে রোদে বা তুষারের দিকে তাকানোর কড়া নিষেধ সত্ত্বেও আমি সানগ্লাস সরিয়ে সামনে তাকিয়ে দেখি চারদিক গাঢ় কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেছে। আর সেই ঝোড়ো সাদা শূন্যতা আমার সারা শরীরে অবিরাম ঝাপটা মেরে চলেছে।

এভাবে খালি চোখে তাকিয়ে থাকা খুব কষ্টকর। সানগ্লাস মুছে নিয়ে চোখে দেবার ঠিক আগের মুহূর্তে যা দেখলাম তাতে আমার নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল। প্রবল তুষারঝড়ের মধ্যে টাল সামলাতে সামলাতে কে একজন এগিয়ে আসছে। প্রথমেই মনে হল রাজা নন তো? হায়, যতটুকু দেখা গেল, রাজা নন! তবে কি কোনও অলৌকিক কিছু, নাকি তুষারপ্রবাহের মধ্যে তুষারেরই ক্ষীণ একটা ছায়ামূর্তি?

দুচোখে অসহ্য তুষারঝাপটা সহ্য করেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অশরীরী ছায়ামূর্তির রহস্য বোঝবার চেষ্টা করছি, এক মিনিটকেই মনে হচ্ছে একঘণ্টা, এইভাবেই কয়েক মিনিট কেটে যাবার পর রাজাকে হঠাৎ চিনতে পেরে প্রাণ ফিরে পেলাম। ঝড়ে বয়ে-আসা সুগন্ধ, হিমালয়ের ওষুধ আর হারানো রাজার দর্শন আমাকে এতক্ষণের সব ভয় থেকে মুক্ত করল। চোখে সানগ্লাস পরে আমিও এবার রাজার দিকে এগোতে লাগলাম।

মুখোমুখি হতেই রাজা বললেন, 'আমাদের ঝড়ের বিরুদ্ধে হাঁটতে হবে। আমার ঠিক পিছনেই এসো, ঝড়ের ঝাপটা থেকে কিছুটা অন্তত বাঁচবে। আমি তোমার জন্যই ফিরে এসেছি। কিন্তু আর দেরি করা যাবে না। আমাকে অনুসরণ করো।'

কিছুক্ষণ পর রাজা হঠাৎ আমার দিকে ফিরে পিছনের দিকে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'এটা কোনও দ্বীপ নয়, এটা একটা বিরাট তুষারক্ষেত্র। এরই উপকূলে আমাদের নামানো হয়েছে। শেষদিকে রেডার ঠিকমতো কাজ করেনি, জাহাজও তাই দিশা হারিয়ে ফেলেছে। আমার মতো পিছন ফিরে হাঁটো, পরিশ্রম কম হবে, হাঁপিয়ে যাবে না।'

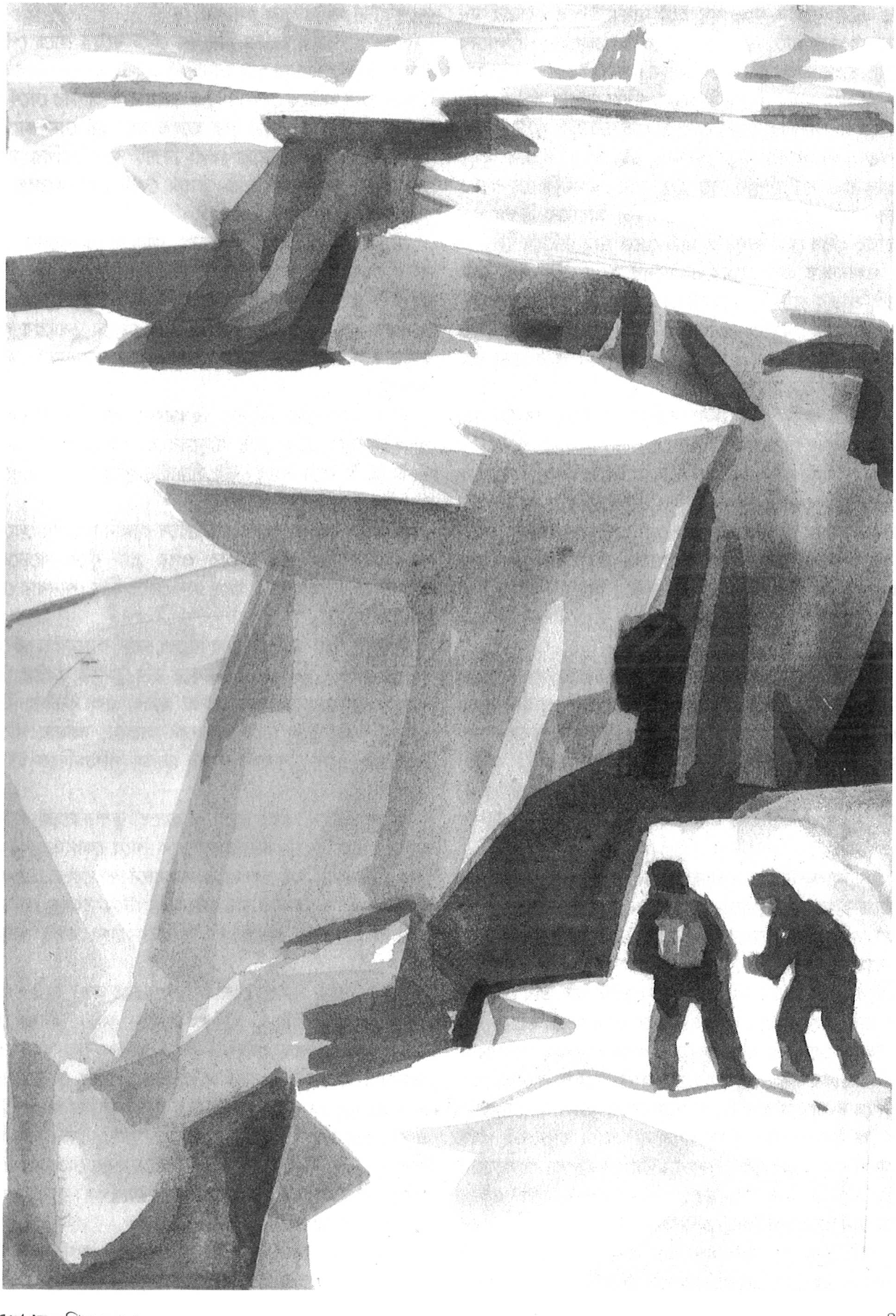
এই আদেশ বা নির্দেশ তখন-তখনই না মেনে রাজার মুখোমুখি হাঁটতে হাঁটতে আমি বলে ফেললাম— 'আপনি কি ঝড়ে একটা আশ্চর্য সুগন্ধ পেয়েছিলেন?'

'তুমি পেয়েছিলে তো? ওই গন্ধের ওষধিগুণ টের পেয়েছ নিশ্চয়ই?'

এই সময় ঝড়ের গতি হঠাৎই কমে এল। বললাম, 'আপনি কী করে জানলেন?'

'আমিই ঝড়ের হাওয়ায় ওই সুগন্ধ পাঠিয়েছি। এ একটা ফুলের গন্ধ। পূর্ব আফ্রিকার জঙ্গলে এই গাছ হয়। আমার যখন আঠেরো বছর বয়স তখন একবার সে-দেশে গিয়েছিলাম, তখনই সাতটা চারা এনে আমার দেশের জঙ্গলে পুঁতেছিলাম, বেঁচেছে মাত্র একটা। আশ্চর্যের কথা, প্রতি দশ বছরে একবারই এ গাছে ফুল ফোটে, শুধু ফেব্রুয়ারি মাসের পূর্ণিমার দিন। ফুল থাকে অমাবস্যা পর্যন্ত, পুরো পনেরোদিন। তারপর কিন্তু ফুল শুকোয় না, ঝরে যায় না, একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

'দশ বছর পর পর ফেব্রুয়ারির ওই পনেরোদিন সেই জঙ্গলের ধারে আমি একটা অসুস্থ পশুদের মেলা বসাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। ওই মেলায় যে-কোনও রুগ্ণ বা মুমূর্ষু



পশু এলে ফুলের গন্ধে সুস্থ হয়ে যায়। শুনলে তোমার মন আলোয় ভরে যাবে— আফ্রিকায় একবার জঙ্গলের গরিলাদের মধ্যে সাংঘাতিক মড়ক লেগেছিল। রোজই বেশ কয়েকটা গরিলা মরে যায়। ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ণিমা লাগার আগে পর্যন্ত অনেক গরিলা মারা গেল, তারপর যেই ওই ফুল ফুটেছে আর একজন গরিলারও মৃত্যু হয়নি। ওই সময় গ্রামের মুমূর্ষু লোকেরাও সব সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। এমনকি লেপার্ডের থাবার ঘা খেয়েও ফিরে আসা একটা মারাত্মক জখম বড় ক্যারিবু হরিণ যেন জাদুবলে মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল।'

'ওখানকার এক গ্রামের মোড়লের কাছে এই ঘটনা শুনে আমি সাতটা চারা নিয়ে আসি। দাম হিসেবে আমার কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু গ্রামের কেউই তা নিতে রাজি হল না। কেন জানো? অতিথিকে কিছু দান করে তার দাম নেওয়া তাদের কাছে অধর্ম।'

'আপনি এখন সেই ফুল পেলেন কী করে, আপনি তো নভেম্বরে দেশ ছেড়েছেন?'

'অমাবস্যার রাতে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবার আগে গাছ থেকে বোঁটাসুদ্ধ ফুল নিয়ে তক্ষুনি মুখবন্ধ শিশিতে রেখে দিলে গন্ধটা টাটকা ফুলের মতোই তীব্র থাকে। প্রয়োজনে শিশির মুখটা একটু ফাঁক করলেই ওই সুগন্ধ হাওয়ায় ভেসে যায়। তবে ফুল কিন্তু শুধু ওই অমাবস্যার রাতেই তুলতে হবে।'

তুষারঝড় শান্ত হতে চারদিক আবার তুষারে ঝলমল করে উঠল।

মাত্র এক-দেড়ঘণ্টার তুষারঝড়ে পায়ের নীচে আরও অন্তত দু-ফুট উঁচু বরফ জমে গেছে। ফলে ঝড় থামলেও হাঁটা এখন বেশি কষ্টকর। যেখানেই পা ফেলি প্রায় উরু অব্দি তুষারে ডুবে যাচ্ছে। তাছাড়া কনকনে হাওয়ারও আর বিরাম নেই।

রাজার পায়ের গর্তে সাবধানে পা ফেলে ফেলে এগোচ্ছি। তিনি খুব দ্রুত হাঁটছেন, ফলে আমারও গতি কমাবার উপায় নেই।

প্রায় আধঘণ্টা পর তুষারের ওপর একটা লম্বা ছায়া চোখে পড়তে রাজা ঘাড় ঘুরিয়ে শুধু বললেন, 'আমরা যন্ত্রটার কাছে এসে গেছি, আর পনেরো-কুড়ি মিনিটের পথ।'

সামনে তাকিয়ে দেখি অনেক দূরে ছোট্টমতো কী একটা তুষারের ওপর খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। ওটাই যদি তাঁর সেই যন্ত্র হয় তাহলে এতক্ষণের ঝড়েও তুষারে ঢাকা পড়ল না!

যেন আমার মনের কথা বুঝেই রাজা বললেন, 'এস্কিমোরা তিমির চর্বির সঙ্গে নানা ধরনের বুনো ফলের বীজের তেল মিশিয়ে ছ-মাস ধরে এ যন্ত্রের গায়ে রোজ দুবেলা মাখায়, ফলে জল বা বরফ যন্ত্রটার গায়ে লাগে না। আমি তখন ওই পর্যন্ত গিয়েছিলাম, তারই চিহ্ন হিসেবে যন্ত্রটা ওই ছুঁচলো বরফচুড়োয় পুঁতে রেখেছি।' সূর্য এখন যতই পশ্চিমে হেলছে, ছায়াটাও লম্বা হয়ে যেন আমাদের পা ছুঁতে আসছে।

আমি তুষারের বুকে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়া ছায়াসুদ্ধ ওই অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য যন্ত্রটার ছবি নেবার জন্য ক্যামেরা বের করছি দেখে রাজা গম্ভীর স্বরে বললেন, 'না।'

এরপর চুপচাপ আরও কিছুক্ষণ হেঁটে যন্ত্রের কাছে পৌঁছে এক-দেড় কিলোমিটার দূরে ডানদিকে একটা অপরূপ নীল হ্রদে আমার চোখ আটকে গেল। বিশেষ করে তার আকার দেখে মন বিস্ময়ে ভরে যায়। হ্রদটা দূরে হলেও মনে হয় যেন কাছেই। এখান থেকে একটা ডানা-মেলা বিরাট স্কুবা পাখির মতো দেখাচ্ছে। যেন কোনও শিল্পী তুষার কেটে বের করেছে এই টলটলে নীল আকার।

এমনিতে স্কুবার রং ধূসর-কালো, কাক বা কোকিলের মতো সুন্দর কুচকুচে কালো নয়, বিশ্রী ময়লা-কালো, কোনও একটা দ্বীপে স্কুবা পাখিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্রিল (চিংড়ি জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণী) খেতেও দেখেছি, কিন্তু এখানে তুষারের বুকে স্বর্গীয় নীল রঙে গড়া স্কুবাকে যেন এক পক্ষীদেবতার মতো দেখাচ্ছে।

নানা আকারের এইসব বিস্ময়কর হ্রদ কি পুরোপুরি প্রাকৃতিক হ্রদ, নাকি এতে মানুষের হাতের ছোঁয়াও আছে? তা-ই বা কী করে সম্ভব? এই সীমাহীন তুষাররাজ্যে মানুষের বাস ছিল না তো কোনওদিন!

রাজাকে দেখলাম হ্রদের পাড় ঘেঁসে কাল্পনিক স্কুবার লেজের দিকে তাঁর যন্ত্রটি রেখে তার ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়েছেন। একবার দেখলাম যন্ত্রটার গায়ে কান পেতে কিছু শোনবার চেষ্টা করছেন।

তাঁকে ও তাঁর যন্ত্রটাকে তাঁর নিষেধ মেনে ক্যামেরার ফ্রেমের বাইরে রেখে হ্রদের এক পাশ ধরে ছবি তুলতে তুলতে তাঁর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলাম। রাজা হঠাৎ এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে যন্ত্রটা তুলে নিয়ে আমাকে বললেন, 'আমার পায়ের চিহ্ন ধরে এসো।' কথাটা বলেই সোজা পশ্চিমদিকে হাঁটতে লাগলেন।

তুষার এখানে আরও নরম বা হয়তো তুষারঝড়েই এরকম হয়েছে। পুরু বরফে রাজার পা ঢুকে গিয়ে কোথাও কোথাও প্রায় হাঁটু-সমান গর্ত। আমাকে সাবধানে পা ফেলে এগোতে হচ্ছে। কোথাও কোথাও গর্ত থেকে পা টেনে তুলতে কষ্ট হয়, একবার তো টাল রাখতে না পেরে বরফের ওপর আছাড় খেলাম।

আহত বাঁহাঁটু সামলে বেশ কসরৎ করতে হল। আর তখনই চোখে পড়ল, বহু দূরে, আকাশ যেখানে অসীম বরফপৃষ্ঠের ওপর নেমে এসেছে, সেইখান দিয়ে একদল কুকুর অনেকটা আমাদের সাইকেলরিকশার মতো একটা গাড়ি যেন উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। এত দূর থেকে মনে হল কয়েকটা মেঠো ইঁদুর একটা বাক্স পিঠে নিয়ে দৌড়োচ্ছে। নিশ্চয়ই সেই সোমালীয় জলদস্যু দুটো। কুকুরে টানা স্লেজ গাড়িতে তারা কোথায় যাচ্ছে! দেখতে দেখতে তারা রাজাকে ছাড়িয়ে চলে গেল। রাজা দেখতে পেয়েছেন কিনা বোঝা গেল না।

তিনি সরলরেখার মতো সোজা গেলেও একটু পর-পরই একবার ডানদিকে, একবার বাঁদিকে বেশ কিছুটা এগিয়ে যন্ত্রটা

তুষারে রেখে তার ওপর ঝুঁকে কিছু শুনছেন বা শোনবার আশা করছেন। হঠাৎই কী একটা শুনে দূর দিগন্তে ডাইনে বাঁয়ে লক্ষ করতে লাগল। আমি দূর থেকেই বুঝতে পারলাম, কুকুরে টানা গাড়ি তাঁরও এবার চোখে পড়েছে।

এখানে এখন তাপমাত্রা কত কে জানে! মাইনাস ১০, ১৫ বা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলেও অবাক হব না। তার ওপর হঠাৎ হাওয়া দিলে আরও কমে যায়। মাঙ্কিক্যাপের নীচে প্রতি সেকেন্ডের গরম প্রশ্বাসটুকুই এই প্রচণ্ড ঠান্ডায় একমাত্র আরাম।

রাজার পায়ের গর্তে পা ফেলে ফেলে এগোনো মোটেই সহজ নয়। টাল সামলাতেও সময় লাগছে। এরই মধ্যে রাজা যে কখন আমার চোখ থেকে হারিয়ে গেছেন খেয়াল করিনি। তাঁর খাড়া যন্ত্রটাও দেখা যাচ্ছে না। এমনিতে আকাশ বাতাস তুষারভূমি এখানে এত স্বচ্ছ যে কয়েক মাইল দূরের মানুষও দেখা যায়। সান্ত্বনা এই যে তাঁর পায়ের ছাপ আগের মতো তুষারপ্রবাহে ঢেকে যায়নি।

তাঁকে না দেখতে পাবার কারণ আবিষ্কার করতে বেশি সময় লাগল না। রাজা তুষারের ওপর হাঁটু গেড়ে প্রায় উপুড় হয়ে শুয়ে বরফে কান পেতে কিছু যেন শুনছেন। তাঁর যন্ত্রটাও তাঁর কপালের কাছেই শোওয়ানো। সেইজন্যই দূর থেকে আমার কিছুই চোখে পড়েনি।

আমি কাছে যেতেই রাজা প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সুগন্ধের শিশি বের করে নিজে নাকের কাছে নিয়ে গভীর তিনটে শ্বাস নিলেন। খুব জোরে হেঁটে এসে আমি হাঁপাচ্ছি দেখে এক টানে আমার নাক থেকে মাঙ্কি ক্যাপের ঢাকনা সরিয়ে শিশিটার ছিপি খুলে সামনে ধরলেন। আমিও তাঁর মতো তিনবার যতটা সম্ভব জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে বাঁচলাম।

রাজা কী করে এতক্ষণ তুষারে শুয়ে ছিলেন ভেবে পেলাম না। তাঁর শিশির আশ্চর্য গন্ধ নিয়ে কয়েক মুহূর্তেই আমার হাঁপানি ঠিক হয়ে গেল, বুকভরে অক্সিজেন নিতে পারলাম। কৃতজ্ঞতায় সাধুর দেওয়া ওযুধটা রাজাকে দিতে চাইলে রাজা বললেন, 'নো, থ্যাঙ্কস। আই ডোন্ট নিড এনি আদার মেডিসিন।' (না, ধন্যবাদ। আর কোনও ওষুধ আমার দরকার নেই।)

রাজা বোধহয় আমার খিদের কষ্টও বুঝতে পেরেছেন, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে তাঁর ব্যাগ থেকে একটা পাতলা ফিনফিনে ছোট্ট বেতের বাক্স দিয়ে বললেন, 'খিদেয় যখন খুব কষ্ট হবে তখন এই বাক্স থেকে একটা করে কাঠি নিয়ে মুখে দিও। চিবোবে না, অনেকক্ষণ ধরে চুযে-চুযে খাবে। এখনই একটা মুখে দাও।'

বাক্সটা অদ্ভুত দেখতে। দেশলাই বাক্সের চেয়ে ইঞ্চিখানেক বেশি লম্বা। বেতের, না কাঠের, না পিচবোর্ডের, নাকি আর-কিছুর— বুঝতে পারলাম না, তবে খুব হালকা আর পাতলা। ভেতরে শুকনো গোটা-হলুদের মতো কিন্তু তার চেয়ে সরু কতগুলো কাঠি, প্রত্যেকটা কাঠি আবার অনেকগুলো আরও সরু সরু কাঠি পাকিয়ে তৈরি।

মুখে দিতে দিতে রাজাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এগুলো কী?'

'একশো আঠাশটি ফলের নির্যাস, তার মধ্যে একাশিটাই তোমাদের অচেনা, বুনো ফলও বলতে পারো। একেকটা কাঠিতে প্রচুর ক্যালরি, তাছাড়া মানুষের বেঁচে থাকার জন্য দরকারি সবরকম ভিটামিন আর মিনারেল। সেইসঙ্গে একরকম কীটের লালা আর কোটি কোটি বছরের প্রাচীন পাহাড়ের পাথর থেকে তৈরি হোমিওপ্যাথি ওযুধের হাজার শক্তিও এর মধ্যে দেওয়া আছে। যতক্ষণ মুখে থাকবে এই শুষ্ক কাঠি তোমাকে তৃষ্ণার জলও জোগাবে।'

আমরা যে এতক্ষণ একটা বিরাট ফাটলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি লক্ষ করিনি। খুব বেশি হলে আধ মাইলের মধ্যে এত বড় একটা ফাটল হাঁ করে আছে— নিশ্চয়ই রাজার চোখ এড়ায়নি।

ফাটলের ওপারে বহুদূর পর্যন্ত অনেকগুলো ছোট-বড় বরফের পাহাড়।

ফাটলের দিকে আরও কিছুটা এগিয়ে রাজা বললেন, 'সামনের ওই ফাটলের কিনার ধরে আমি প্রথমে ডাইনে হাঁটব। কতক্ষণ, জানি না। যদি আর ফিরে না আসি তাহলে আমি যে পথে যাব তুমিও সেই পথে চলে আসবে, আমার পায়ের চিহ্ন ধরে। আমার জন্য তোমাকে এক-দুঘণ্টা বা হয়তো তিন ঘণ্টাও অপেক্ষা করতে হবে। যদি ফিরে আসতে হয় তাহলে আবার যেতে হবে ফাটলের ধার বরাবর বাঁদিকে। তখন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।'

ফাটলের সামনে এসে বিস্ময়ে বোবা হয়ে যেতে হয়— বিরাট ফাটলের ভেতরে তীব্র নীল আলো! এ কী করে সম্ভব?

রাজা সেই নীল আলোর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে কিছু না বলে তার যন্ত্র নিয়ে চলে গেলেন।

এই নীল আলো বা তীব্র নীলের আভা আসছে কোথা থেকে! ফাটলের মধ্যে ঝুঁকেও আরও ঘন নীল ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। দেড়-দুসপ্তাহ আগেই কবে যেন একদিন সিয়েরভাকোভে হিমশৈলের খাঁজেও নীল রং দেখেছিলাম, তা ছিল অনেক হালকা আর বেশিরভাগই খুব ছোট আকারের। জাহাজের হিমবাহ ও হিমশৈল বিশেষজ্ঞ মিঃ কাহান আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন— এই নীল রং আসলে হিমশৈলের ভেতর থেকেই আসছে। যে হিমশৈল যত পুরনো তার রং তত নীল। কেননা বরফ যত জমাট বাঁধে ততই বরফের ভেতরের বায়ু বেরিয়ে যায়, আর সেই শক্ত জমাট হিমশৈল সূর্যের সব রং শুষে নিয়ে শুধু তীব্র নীল রং বিচ্ছুরণ করে।

কিন্তু এই ফাটলের নীল আলোর কী ব্যাখ্যা? এটা তো নিশ্চয়ই কোনও দ্বীপ বা উপসাগরের কূল-ঘেঁসা কোনও হিমশৈল নয়, এই নীল আলোও পর্বতাকার হিমশৈলের পেট বা বুকের খাঁজ থেকে বেরচ্ছে না, আসছে আমার পায়ের সমতলে সীমাহীন তুষারক্ষেত্রের সুদীর্ঘ ফাটল থেকে।

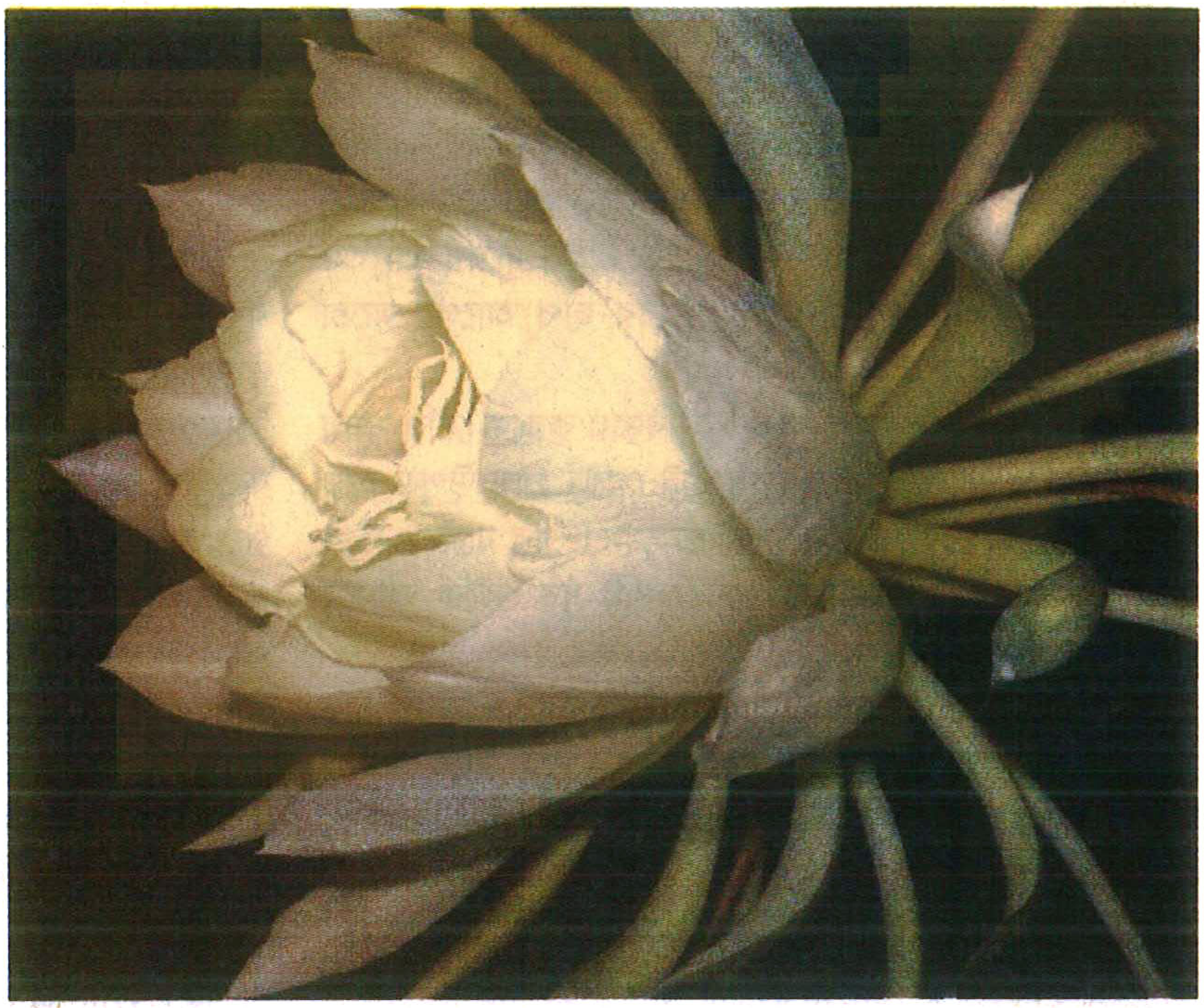
ছবি: যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

এরপর আগামী সংখ্যায়

ক্রিসমাস ফ্লাওয়ার

জন পূততুণ্ড

বাবা কাজ করতেন সেটেলমেন্ট অফিসে। একবার বদলি হয়ে বাঁকুড়ার সারেঙ্গাতে গেলেন। কয়েক মাস বাদে কয়েকদিনের ছুটিতে বাড়িতে এলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন দুটি সবুজ পাতা। ছোড়দিকে দিয়ে বললেন, 'এগুলো একটা টবে লাগিয়ে দিও কেমন।' পাতাদুটি ছিল অনেকটা পাথরকুচি পাতার মতো, তবে বেশ লম্বাটে আর তাদের বৃন্তটা বেশ মোটা। বৃন্তটা মাটিতে পুঁতে দিলেই তা গাছে রূপান্তরিত হত। তিনি আরও বললেন, 'গাছটার নাম হল স্টার অব বেথলেহেম। এই গাছ পাহাড়ি অঞ্চলে খুব ভালো হয়। বছরে দুয়েকবার ফুল ফোটে, তবে রাত বারোটায়। আর ভোরে সূর্য উঠলেই বুজে যায়। এই ফুলকে কেউ কেউ বলেন নাইট কুইন। আবার কেউ বলেন রাত কী রানি।'



আমি প্রশ্ন করলাম, 'রাত বারোটায় ফোটে! তাহলে দেখব কী করে?'

তিনি বললেন, 'যখন গাছে কুঁড়ি আসবে তখন তা ধীরে ধীরে বড় হবে। তারপর বোঝা যাবে কবে ফুটবে, সেদিন রাতে জেগে থাকলেই দেখতে পাবে। আসলে যেদিন ফুলের পাপড়িগুলি মাথার দিক থেকে অল্প খুলে আসবে, সেদিন রাতেই ফুটবে।'

এরপর বাবার ছুটি শেষ হয়ে গেল। তিনি সারেঙ্গা ফিরে গেলেন। তারপর দিনের পর দিন গাছটা ঝাঁকড়া হয়ে উঠল। কিন্তু সে গাছে কুঁড়ি আসার কোনও চিহ্ন নেই। আমি একদিন রাগ করে দিদিকে বললাম, 'শোন, এগাছ রেখে কোনও লাভ নেই।'

দিদি বলল, 'বাবা যখন বলেছেন, আর অত কষ্ট করে এনেছেন, তখন দেখি না আরও কিছুদিন।'

বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন ভোরবেলায় দিদি ছাদ থেকে নেমে এসে বলল, 'মা, মনে হচ্ছে স্টার অব বেথলেহেমে কুঁড়ি আসছে।'

সবাই আমরা ছাদে গিয়ে দেখলাম যে সত্যিই কুঁড়ি আসছে।

ঠিক তিনদিন পর লক্ষ করলাম যে কুঁড়িটা বেশ বড় মাপের হয়েছে। সেদিন সন্ধের সময় মা টর্চলাইট নিয়ে ওপরে গিয়ে দেখলেন যে কুঁড়িটার মাথার দিকের হালকা গোলাপি রঙের পাপড়িগুলি অল্প খুলতে শুরু করেছে। মা নীচে নেমে এসে বললেন, 'মনে হয় আজ রাতেই ফুল ফুটবে। সবাইকে দেখতে হলে জেগে থাকতে হবে।'

দুই দিদি আর আমি আমাদের পাড়ার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের গিয়ে জানিয়ে এলাম, কারণ তারা আগে থেকেই গাছটার ফুল দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিল।

তারপর ছাদে আমরা সকলে মিলে উঠে স্টার অব বেথলেহেম গাছটিকে মাঝখানে রেখে চারধারে বসে রইলাম। তখন ঘড়িতে বাজে সাড়ে আটটা। তখন মনে হচ্ছে আমাদের ছাদের ওপর ছোটখাটো এক মেলা বসেছে। দিদিরা মুড়ি-চানাচুর-পিঁয়াজ-লঙ্কা দিয়ে মেখে নিয়ে এসেছে, আর সবাই মিলে তা খাওয়া হচ্ছে।

'এখনও বহুক্ষণ বসে থাকতে হবে তাই না?' মাকে প্রশ্ন করলাম।



তিনি বললেন, 'তোমার বাবা তো বলেছে, রাত বারোটায় ফুল ফুটবে।'

গল্প শুনতে শুনতে কোথা থেকে সময় কাটতে শুরু করল কে জানে! আর কিছুক্ষণ বাদেবাদেই টর্চ দিয়ে দেখা হচ্ছে কুঁড়িটিকে। এরপর হঠাৎ দেখা গেল কুঁড়ির বৃন্তটা মৃদু মৃদু নড়ছে, পাপড়ি একটি-দুটি করে ধীরে ধীরে খুলছে, যেন সাদা রঙের এক প্রজাপতি তার পাখনা মেলছে।

ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা, মিনিটের কাঁটা ঘুরছে, কিন্তু ঘণ্টার কাঁটা ঘুরতে অস্বাভাবিক সময় নিচ্ছে! একে একে স্টার অব বেথলেহেমের সাদা পাপড়িগুলি খুলে গেল, কিন্তু তার মাঝখানে পাপড়ির গোড়া থেকে উঠে আসা সরু সরু হালকা হলুদ রঙের হাজারো পরাগ-কেশরগুলি মনে হল যেন কিছু একটা ঢেকে রেখেছে। চারধার এক মিষ্টি সুবাসে ভরে উঠল। তখনও কুঁড়ির প্রধান বৃন্তটি মৃদু মৃদু কাঁপছে।

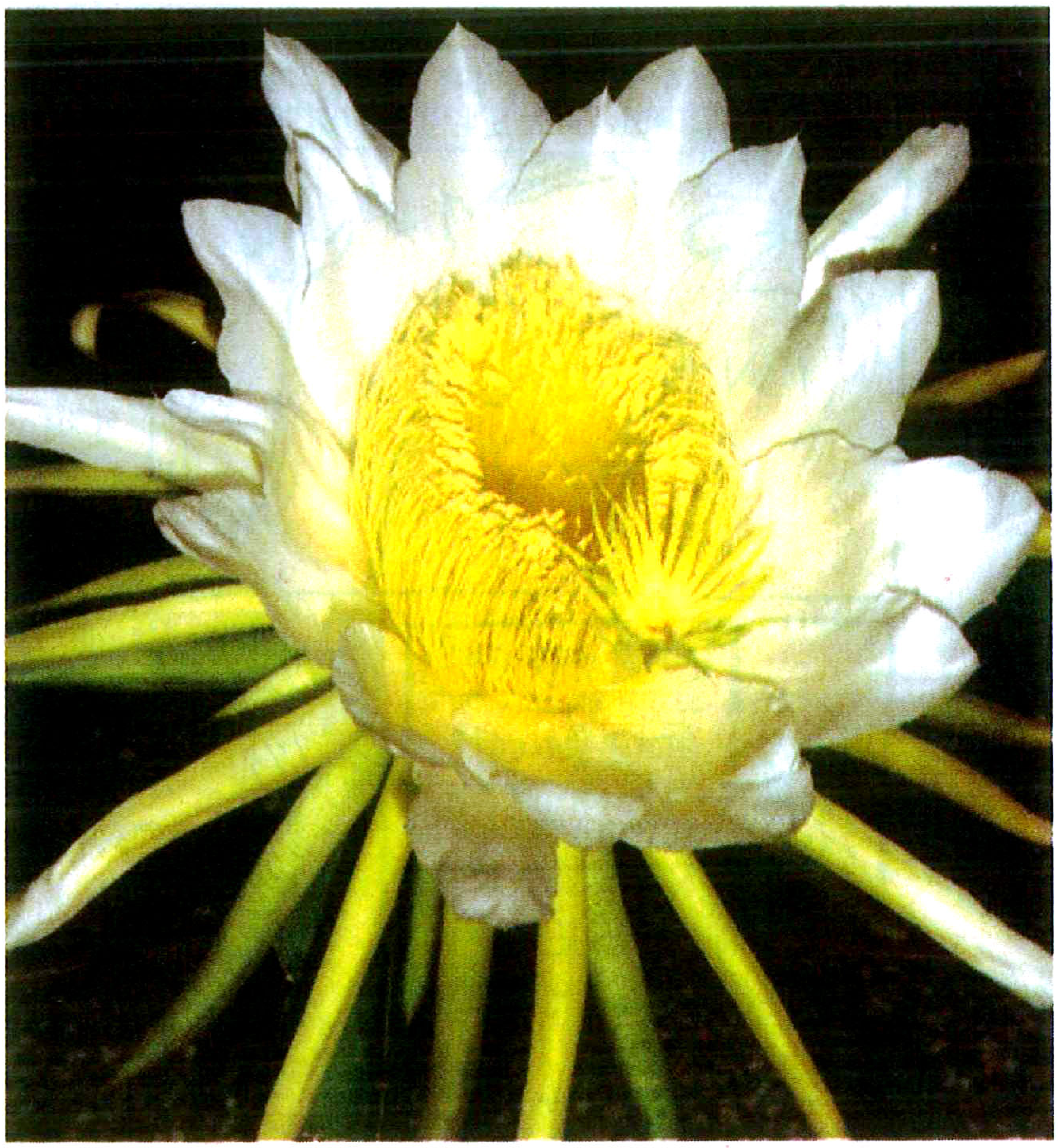
ঘড়িতে তখন ঠিক রাত বারোটা, সঙ্গে সঙ্গেই ফুলের মাঝখানটা খুলে গেল এবং দেখলাম সেই সরু সরু পরাগ-কেশরগুলি শাদা রঙের আর তাদের মাথায় গাঢ় হলুদ রঙের রেণু। সেগুলি চারধারের পাপড়িগুলির গায়ে এলিয়ে পড়ল। আর এতক্ষণ যা মনে হচ্ছিল মধ্যিখানে কিছু একটা ঢাকা আছে, তখন তা আমরা সত্যিই দেখতে পেলাম। অন্য সব সরু সরু কেশরগুলির চেয়ে একটু মোটা একটা শিষ সোজা ওপরের দিকে উঠে সামনের দিকে একটু হেলে রয়েছে আর তার ডগায় একটি ছোট তারার মতো। ঠিক তার নীচে, অর্থাৎ শিষটির গোড়ায় একটা ছোট্ট লম্বাটে পিণ্ড, যেন আকৃতিতে এক শিশু শুয়ে আছে।

তাই দেখে, আমি জোরে চিৎকার করে উঠলাম, 'ক্রিসমাস ফ্লাওয়ার, ক্রিসমাস ফ্লাওয়ার।'

যদিও কারও মন চাইছিল না ছাদ থেকে নেমে আসার, কিন্তু তাহলে তো ভোর অবধি জেগে থাকতে হবে। বিছানায় যাবার আগে মাকে জানিয়ে রাখলাম ভোরবেলায় জাগিয়ে দিতে। মা ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে দিলেন ভোর সাড়ে চারটেয়। বিছানায় শুয়ে ফুলটার কথা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোর সাড়ে চারটেয় এলার্ম বেজে উঠল। ঘুম ভেঙে গেল। মা, দুই দিদি আর আমি আবার ছাদে গিয়ে বসলাম। দেখলাম ধীরে ধীরে ফুলটা বুজতে শুরু করেছে, যদিও এখনও পুরো বুজতে দেরি আছে। সূয্যিমামা যদি আর একটু দেরিতে ওঠে তাহলে ফুলটাও আরও কিছুক্ষণ দেখতে পাব!

আস্তে আস্তে পুব আকাশ লাল হয়ে এল। বড় একটা ফুলের মতোই সূয্যিমামা ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করল। ফুলটাও একটু একটু করে নিভতে নিভতে পুরোটা নিভে গেল।



সুখের খোঁজে

চিত্রনাট্য ও ছবি • কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়




দ্যাখ না দ্যাখ, টাকার পুঁটুলিটা ছোঁ মেরে তুলে মোল্লা দিল চম্পট!!
আহ! আর আমাকে পায় কে!
লোকটিও তখন কান্না সামলে চেঁচাতে লেগেছে
ওগো, কে কোথায় আছ গো... মোল্লা আমার সর্বস্ব নিয়ে পালাচ্ছে।
ওরে পেটে পেটে এই ছিল! হতভাগা, বেল্লিক! থাম্... থাম্ বলছি।
শয়তানটা গেল কোথায়? একবার ধরতে পারলে...
মোল্লা নাসিরুদ্দিন গিয়ে লুকিয়েছে গাছের আড়ালে
কিন্তু আর কি মোল্লাকে পাবো! হায় হায় আমার সর্বস্ব গেল।
এই সময় হঠাৎই পাশে নজর পড়তে...
এই তো আমার পুঁটুলি!
আহ! ফেরত পেয়েছি! সবই মালিকের দয়া!
মোল্লাই কখন ফাঁকতালে রেখে গেছে!
এক পাক নেচেও নিল
...পুঁটুলি আমার পুঁটুলি...
এতক্ষণ কোথায় ছিলি...
...ওরে পুঁটুলি...
তখন দূরে
ওরে মূর্খ! এই তাহলে তোর সুখ!
শেষ

হারানো বইয়ের খোঁজে: পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

পাতাবাহার

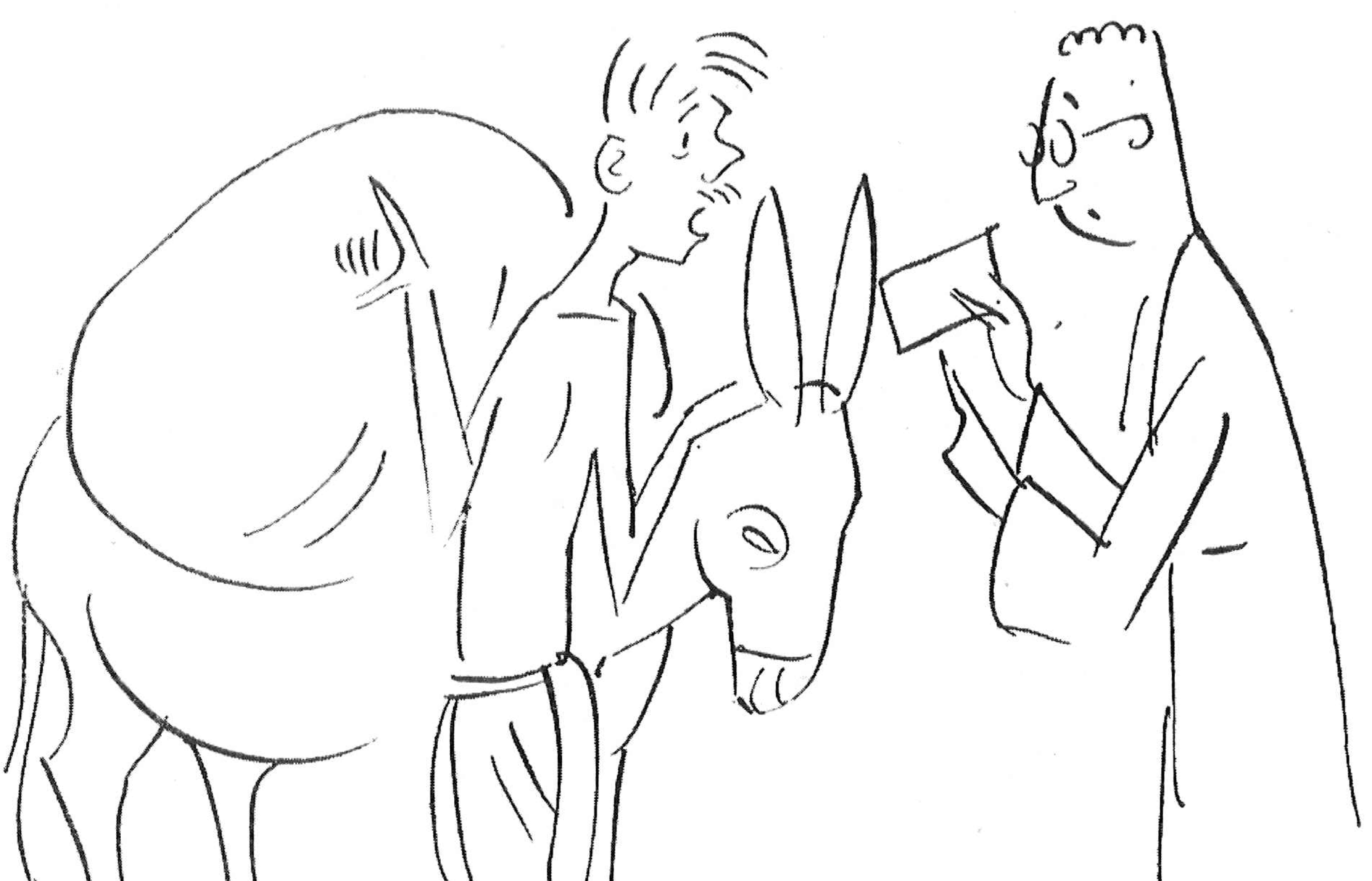
আজ থেকে পঞ্চাশ বছরেরও আগে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বেরিয়েছিল ছোটদের কথা ভেবে চমৎকার একটি সংকলন। নাম 'পাতাবহার'। খালেদ চৌধুরির আঁকা মলাট। ভেতরে সত্যজিৎ রায়ের আঁকা ছবি। পূর্ণেন্দু পত্রীও ছবি এঁকেছিলেন। তখনও তিনি নিজের নাম লিখতেন 'পূর্ণেন্দু শেখর পত্রী'।

'পাতাবাহার'-এ ছবি-গল্প-ছড়া-কবিতা তো ছিলই, ছিল বেশ ক'টি মনে রাখার মতো প্রবন্ধ। এমনকি ধাঁধা ও ছোটদের প্রবন্ধে সিদ্ধহস্ত ছিলেন দর্শনশাস্ত্রের সুপণ্ডিত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর লেখা প্রবন্ধ 'ম্যাজিক, ম্যাজিক' ছোটরা পড়বে মুগ্ধ হয়ে। গল্পচ্ছলে বিষয়ের গভীরে নিয়ে গিয়েছেন তিনি। ব্যাখ্যা দিয়েছেন জাদু-বিশ্বাসের। অতি প্রাচীন কাল থেকে কত না বিশ্বাস মানুষের মনে জাঁকিয়ে বসেছে! বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এই বিশ্বাসের শেকড়বাকড়।



জীবনী পর্যায়ে রয়েছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও আলবার্ট আইনস্টাইনের কথা। ছড়া-কবিতা রয়েছে অনেকগুলি। সুখলতা রাও, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায় ও আরও দু-তিনজনের।

সংকলনটির শুরু হয়েছে সুকুমার রায়ের কবিতা দিয়ে। 'কলিকাতা কোথা রে' অপ্রকাশিত এই দীর্ঘ কবিতাটির ছবি এঁকে দিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। গিরিডিতে বাসকালে সুকুমার এ কবিতাটি লিখেছিলেন, ১৯২২-এর জানুয়ারিতে। ভারি মজাদার কবিতা। 'টাইমটেবিল' খুলে পুরী-পাটনা, গয়া-গোমো এমনকি বজবজ-দমদমের সন্ধান পাওয়া গেলেও পাওয়া যায়নি কলিকাতা স্টেশনের উল্লেখ। 'কলিকাতা কোথা





রে' বলে হা-হুতাশ করেছেন সুকুমার রায়। সুখের কথা, রেল কোম্পানি ঢের বিলম্বে হলেও 'কলকাতা' স্টেশন গড়েছেন। 'টাইমটেবিল' হাতড়ে আজ আর নিরাশ হতে হয় না।

সুকুমার রায়ের কবিতার পরেই রয়েছে সুখলতা রাওয়ের কবিতা। তারপরেই লীলা মজুমদারের গল্প। গল্পে নাম 'ভানুমতীর খেল' দারুণ মজার সে-গল্প। রায়চৌধুরি পরিবারের তিন সদস্যের অনাবিল আনন্দের তিনটি লেখার পাঠান্তে আমরা পৌঁছে যাই কঠিন বাস্তবে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অলৌকিক লৌকিকতা' গল্পটি এই সংকলনেই প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল। মুগ্ধ হয়ে পড়তে হয় 'পাতাবাহার'-এর 'শালপাতার ডাক' গল্পটিও। সোমা সাঁওতালের এ গল্প পড়ে প্রকৃতির মাঝে, শাল-পিয়ালের দেশে বেড়ে ওঠা মানুষজনের লড়াই-সংগ্রাম সম্পর্কে আঁচ করতে পারি আমরা। পিয়ালজোড়া গ্রামের সংগ্রাম কাহিনীতে আমরাও প্রাণিত হই। এ সংকলনের সেরা গল্প নিঃসন্দেহে সমরেশ বসুর 'পুনিয়া'। বড়দের লেখায় সিদ্ধহস্ত, মানুষটি যে ছোটদের জন্য এমন মানবিক গল্প লিখতেন, তা ক'জনেরই বা জানা আছে! জগদ্দলের শ্রীভগবান মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে কাজ করতে আসা বারো বছরের পুনিয়ার দুঃখ-দুর্গতি আমাদের মন ছুঁয়ে যায় বললে সব বলা হয় না। পড়তে পড়তে অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে চোখের কোল দোকানের মালিক হৃদয়হীন মহাবীর পুনিয়াকে চোর অপবাদ দিয়ে ভয়ংকর অত্যাচার করেছে। বীভৎসভাবে জ্বলন্ত শিকের ছ্যাঁকা দিয়েছে। অত্যাচার-পীড়নে জেরবার পুনিয়া মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে। জগদ্দলের গরিবগুরবো মানুষ শেষে শায়েস্তা করেছে মহাবীরকে। পুনিয়া সেসব দেখতে পায়নি। সে তখন গঙ্গার ওপারের হাসপাতালে। গল্পে আছে, 'বিকালবেলা সে চোখ মেলে দেখল, তার সামনে তার মা। হাসপাতালে আছে বলে সে জানে না, প্রথমেই বলল, মা, আমি চুরি করিনি। মা তাকে বুকের কাছে নিয়ে বলল, জানি বাবা।'



'পাতাবাহার'-এর পাতায় পাতায় কত না বাহারী লেখা কোনওটি আনন্দের, পরম উপভোগ্য, আবার কোনওটি দুঃখের, গভীর অনুভবের। চিন্মোহন সেহানবীশের গল্পটিও চমৎকার। গল্পের নাম 'একটা দুপুরের গল্প'। সেদিন দুপুরে হঠাৎই শোনা গেল পিসিমার বাজখাঁই গলা, 'এখনো ফিস্‌ফিস শুনছিল কেন? যে যে ঘুমিয়েছে জলদি হাত তোলো।' পিসিমার কথায় সাড়া দিয়েছে খেপু। চিন্মোহন জানিয়েছেন, 'জানলার সরু ফুটো দিয়ে যে এক চিলতে আলো ঘরে সেঁধোচ্ছিল, তাতে দেখা গেল তিনি জোড়া হাত ঝট করে খাড়া হয়ে উঠল। খেপুটার মাথা আবার বেশি পরিষ্কার। হঠাৎ সে জিব কেটে হাত নামাতে নামাতে বলে উঠল: ঘুমন্ত মানুষ বুঝি হাত তুলতে পারে!'

ভালো লেখার, মন-ছোঁয়া লেখার যেন শেষ নেই। কোনও সংকলনে একসঙ্গে এত ভালো লেখা আগে তো নয়ই, পরেও কি তেমন পাওয়া গিয়েছে? সোমনাথ লাহিড়ীর 'খবরের খবর' লেখাটিতে রয়েছে সংবাদপত্রের অন্দরমহলের না-জানা সংবাদ। কৌতূহল-জাগানিয়া এ লেখার পাশাপাশি রয়েছে জ্যোতিভূষণ চাকীর মিষ্টিমধুর লোককথাও। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছোটদের জন্য যে এমন একটি সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন, তা বোধহয় আমরা অনেকেই ভুলে গিয়েছি। খুঁজেপেতে একালের ছোটদের হাতে 'পাতাবাহার' তুলে দিলে তারা যে ভারি খুশি হবে, তা হলপ করে বলা যায়।

ছবিগুলি রায় পরিবারের সৌজন্যে মুদ্রিত

বেড়ালগুহার রহস্য

গল্পের শেষটুকু। ১০ পাতার পর

এতক্ষণ পরে একটা মানুষ দেখতে পেয়ে ভরসা দেবার জন্য মোহিতোবাবু মেয়েটির কাঁধে আলতো করে হাত রাখতেই সে ভয়ে আঁতকে উঠল। মোহিতোবাবু তখন তাকে গড়গড় করে মাঠ, বাচ্চা, বল, গর্ত, পাঁচিল, দড়ি সমেত এখানে আসার গোটা ইতিহাস বলে দিয়ে শেষে জানতে চাইলেন মাটির তলার এই শহরের রহস্যের কথা।

মেয়েটা একটু ইতস্তত করল। তারপর সামনের দিকে চেয়ে এক নিঃশ্বাসে বলে গেল অদ্ভুত এক কাহিনী— 'দুদিন আগের ঘটনা। তিনদিনও হতে পারে। মাটির তলার গোপন গুহাকন্দর থেকে বেরিয়ে এসেছিল যত জংলী বেড়াল, ইয়া ইয়া তাদের লোম, আগুনঝরা চোখ, তরোয়ালের মতো নখ, করাতের মতো দাঁত, দানবিক সব আজব জানোয়ার। আচমকা এসে তারা ঝাপিয়ে পড়েছিল শহরবাসীদের ওপর। তাদের তীক্ষ্ণ চিৎকারে কাচ ফেটে চৌচির, পাথর ভেঙেচুরে গোটা শহরটাই নিমেষে ধ্বংস হয়ে গেল। আমার আত্মীয়-স্বজনদের কী গতি হয়েছে জানি না, আমি দৈবাৎ একটা বড় সিন্দুক দেখতে পেয়ে তার মধ্যে লুকিয়ে বেঁচেছি। কিন্তু তারা আবার এল বলে, পাথরের তলায় তাদের চাপা গর্জন শুনতে পাচ্ছ না?'

মোহিতোবাবু তখন খিদে তেষ্টায় কাবু। মেয়েটি তাঁকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গিয়ে খুঁজে-পেতে যা জুটল তাই খেতে দিল ধরে। খেতে বসে শিল্পীর চোখ গেল ঘরের কোনে রাখা কিছু কাগজ-কলমের দিকে। সেখানে কয়েকটা তুলি আর দোয়াতভরা কালিও ছিল। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে তিনি সাদা কাগজগুলো ভরিয়ে তুলতে লাগলেন নানা রঙের আর ঢঙের বেড়ালের ছবিতে। একেকটা কাগজে একেকটা বেড়াল। কারও পিঠটা ধনুকের মতো বাঁকানো, এই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ে, কারও মুখটা ফাঁক করা, হিংস্র দেঁতো হাসি, এইরকম অসংখ্য বেড়াল ফুটে উঠতে থাকল সাদা কাগজের পিঠে।

শেষ দোয়াতের শেষ ফোঁটা কালিও যখন শেষ হয়ে গেল, মোহিতোবাবু তখন ছুটে বেরলেন বাড়ির বাইরে, আর যেখানে যত খাড়া দেওয়াল ছিল সবকটার গায়ে সেঁটে দিতে লাগলেন ছবিগুলো। কাজ শেষ হতেই দৌড়ে এসে সেই মেয়েটির সঙ্গে সিন্দুকে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন কী হয় দেখার জন্য।

রাত নামতেই চারদিক থেকে তীক্ষ্ণ, হিংস্র গর্জন শুরু হয়ে গেল আর মাটির তলাকার সব গুহাগর্ত থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে এল বিশাল সব কালো কালো বেড়াল। বলা ভালো বেড়ালরূপী দৈত্য। এসেই তাদের সে কী দৌরাত্ম্যি আর চিৎকার!

সিন্দুকের ডালার তলা থেকে একটুখানি মুখ বাড়িয়ে মোহিতোবাবু দেখেন, কী আশ্চর্য! ওইসব ভয়ানক জন্তুদের মোকাবিলা করছে তাঁরই আঁকা কাগজের বেড়ালেরা। সবাই যে যার কাগজ থেকে বেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দুষ্টু বেড়ালগুলোর ওপর। থাবায় আর নখে, দাঁতে আর লোমে, রঙে আর কালোয় ঠোকাঠুকি, মারামারি, গুঁতোগুঁতি। সে কী সাংঘাতিক লড়াই! আর চলছে তো চলছেই।

অনেকক্ষণ এরকম ভয়ানক যুদ্ধ চলার পর শেষ পর্যন্ত জিতল কিন্তু কাগজের বেড়ালগুলোই। দল বেঁধে লেজ উঁচিয়ে তারা পার করে দিয়ে এল হেরো দলকে শহরের সীমার বাইরে। ফোকলা দাঁত, চ্যাপ্টা থাবা আর ভোঁতামুখ নিয়ে লোম ওঠা কালো বেড়ালগুলো লেজ গুটিয়ে একে একে ফিরে গেল নিজেদের ডেরায়। অমনি রঙিন বেড়ালগুলো টপাটপ উঠে গেল যে যার নিজের কাগজে। একটু পরে তাদেরও আর কোনও চিহ্ন রইল না। সাদা শহরের ধবধবে পাথরের গায়ে লেপটে রইল কিছু সাদা কাগজ।

মোহিতোবাবুর পিছন পিছন সিন্দুক থেকে বেরিয়ে মেয়েটি আনন্দে প্রায় কেঁদে ফেলল। শিল্পীকে হাতজোড় করে সে বলল, ''আপনি কত বড় বীর, আঁকা ছবি দিয়ে একটা গোটা শহরকে বাঁচিয়ে দিলেন! আপনি এখানেই থাকুন না।''

বীর আঁকিয়ে বললেন, ''তা কী করে হবে? ওপরে আমার বাড়ির লোকেরা অপেক্ষা করছে যে! আমি কথা দিচ্ছি আবার আসব।''

এই বলে মেয়েটির সাহায্যে তিনি সেই গর্তটার কাছে ফিরে এসে আবার দড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। উঠতে আরও বেশি সময় লাগল, কিন্তু মোহিতোবাবু তখন অন্য মানুষ, নিজের মনেই বলে চলেছেন, ''আমি কত বড় বীর! একটা গোটা শহরকে উদ্ধার করেছি।''

ওপরে উঠে আর এক বিস্ময়! না আছে মাঠ, না আছে পাঁচিল। তার জায়গায় উঁচু উঁচু সব বাড়ি, চওড়া চওড়া রাস্তা, অচেনা মানুষজন। মোহিতোবাবু কোনওরকমে পথ চিনে নিজের বাড়িতে এসে দেখেন বাড়ি খালি, তালাবন্ধ, বাগানে শুধু আগাছা। আশ্চর্য! বাড়ির লোকরা সব গেল কোথায়? তিনি একে ওকে জিজ্ঞেস করেন, কেউ কিছু জানে না।

শেষে এক বুড়োর বুড়ো তস্য বুড়ো হঠাৎ বলে ওঠে, ''মোৎসুহিতো, মানে মোহিতোবাবু, হ্যাঁ, হ্যাঁ ওই নামে তো ছিল একজন''। তারপর নিজের সাদা চুল দাড়িওলা মুখটা মোহিতোবাবুর খুব কাছে নিয়ে এসে বলে, ''আপনি অ্যাদ্দিন ছিলেন কোথায়? আমি হলাম সেই ছেলেটি যে গর্তে বল ফেলে দিয়েছিল।''

মোহিতোবাবু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। তিনি তো বড়জোর দুদিন ছিলেন না বাড়িতে। এর মধ্যে এত কাণ্ড! তারপর জানতে চান তাঁর বাড়ির লোকেরা এখন কোথায়। কেউ কিছু বলতে পারে কি?

দাড়িওলা, নুয়ে পড়া বুড়ো মানুষটি কিছু না বলে শহরের পুবদিকের গোরস্থানের দিকে শীর্ণ হাতটা বাড়িয়ে দেন। এক দৌড়ে সেখানে গিয়ে মোহিতোবাবু দেখেন সারি সারি শুধু কবর আর কবরের ওপর নাম লেখা সব পাথরের ফলক। খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত তিনি পেয়ে গেলেন তিনটি ফলক যার গায়ে তাঁর স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের নাম লেখা। সেখানে লম্বা লম্বা ঘাস গজিয়েছে। কবর প্রায় দেখাই যায় না।

মোহিতোবাবু উন্মাদের মতো ঘাসগুলো ছিঁড়তে থাকে দু-হাতে। তখন হঠাৎই তাঁর কানে আসে, ''করো কী? এই, আমার চুলগুলো সব ছিঁড়ে ফেলবে নাকি?''

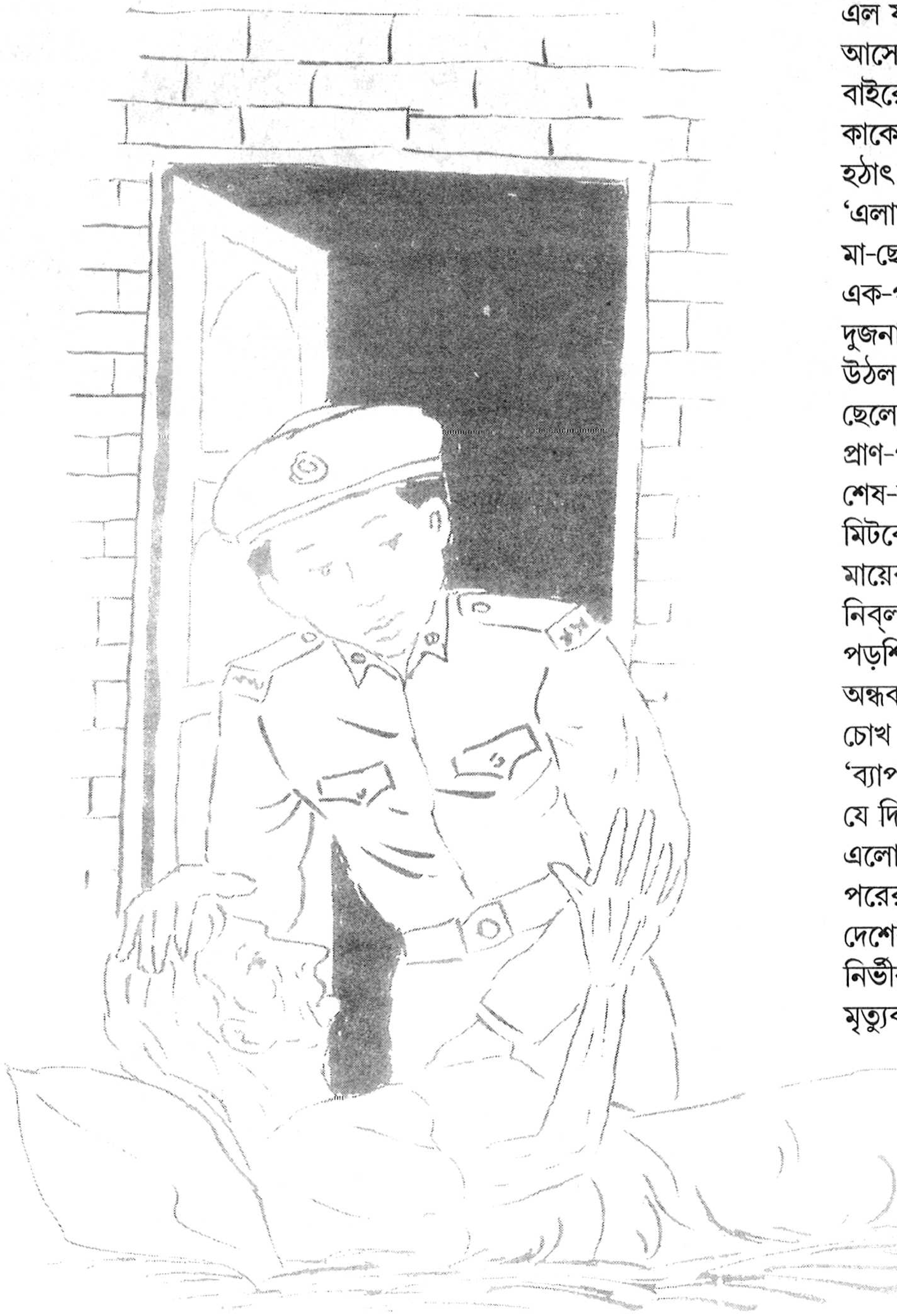
যাঃ, এ তো তাঁর স্ত্রীর গলা, আর তিনি শুয়ে আছেন নিজেদেরই খাটে! এই এত ঘটনা তবে শুধুই একটা স্বপ্ন?

মা ও ছেলে

প্রণবকান্তি সিনহা

চিন-ভারতে যুদ্ধ হল শুরু
মা-কে ছেড়ে যুদ্ধে গেছে ছেলে,
মায়ের বুকটা কাঁপছে দুরু দুরু
সান্ত্বনা পায় ছেলের চিঠি পেলে।
‘নিয়ম করে চিঠি লিখিস মাকে,’
অভাগী-মার একটি মাত্র দাবী।

ছেলে-রতন চিঠি পাঠায় ডাকে
মার কাছে তা আনন্দেরই চাবি।
মাঝে মাঝে মনটা কেমন করে,
লিখেছে সে, যুদ্ধটা শেষ হলে
মায়ের কাছে ফিরবে কদিন পরে,
মাকে ছেড়ে আর যাবে না চলে।



ছেলের কাছে সুদুর পরবাসে
বুড়ি-মায়ের মনটা পড়ে থাকে,
নিয়মমতো ছেলের চিঠি আসে
মাসে মাসে টাকাও আসে ডাকে।
এমনি করে ছ’মাস ঘুরে গেল,
মা এখানে, ছেলে অনেক দূরে,
চিঠিতে মা ছেলের ছোঁয়া পেল,
তবু ব্যথা মায়ের মনটা জুড়ে।
রোগে রোগে জর্জরিত দেহ,
পাড়া-পড়শি শয্যা-পাশে থাকে,
এল যারা আত্মীয় নয় কেহ,
আসে কেবল ভালোবাসার ডাকে।
বাইরে আঁধার, মায়ের উদাস-মন
কাকে যেন খুঁজছে দুচোখ মেলে,
হঠাৎ যেন বলল এসে রতন—
‘এলাম মাগো, রতন, তোমার ছেলে।’
মা-ছেলেতে এই জীবনের মতো
এক-পলকের এটাই শেষদেখা,
দুজনারই চোখে অবিরত
উঠল ফুটে করুণ অশ্রুরেখা।
ছেলের হাতের জলটা পাবে বলে
প্রাণ-পাখিটা যায়নি ছেড়ে দেহ,
শেষ-সময়ে ছেলের হাতের জলে
মিটবে তৃষা, নাহিকো সন্দেহ।
মায়ের মুখে জলটা দেওয়ার সাথে
নিব্‌ল আলো, ঘন-নিঝুম রাতি,
পড়শিরা কেউ দীপশলাকা হাতে,
অন্ধকারে জ্বালায় মোমের বাতি।
চোখ কপালে তুলে বলে সবাই—
‘ব্যাপারটা কি? ব্যাপার বুঝি না যে—
যে দিকে চাই, রতন কোথাও নাই,
এলো তো সে মায়েরই শেষকাজে।’
পরের দিনই সৈন্য-শিবির জানায়
দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে রতন,
নির্ভীক সে, চিনা-সৈন্য হানায়
মৃত্যুবরণ করে বীরের মতন।

ছবি: পঞ্চানন মালাকার



চলো চাপড়ামারি

অনুনয় চট্টোপাধ্যায়

শীতের শেষে ঘুরতে যাব
প্রতিবছর যাই,
চা-সিঙারা সঙ্গে নিয়ে
বসলাম সবাই।

কোথায় যাব, কোথায় যাব,
ভাবছি যখন তাই,
হঠাৎ মনে পড়ে গেল
ডুয়ার্স ও তরাই!

বিন্দু-ঝালং-রামশাই
নয়তো বা গাছ-বাড়ি,
কথায় কথায় জিতেই গেল
সবুজ চাপড়ামারি।

ভোরের ট্রেনে পৌঁছে যাব
চালসা তাড়াতাড়ি,

সেখান থেকে লাগাও দৌড়
নিয়ে মোটরগাড়ি।

বনের মাঝে বাংলো আছে
বড়ই মনোরম,
দশটা দিন কাটিয়ে এলেও
লাগবে যেন কম।

হরিণ-হাতি-গন্ডার আর
বাইসনের দল,
পাব কত পাখির দেখা
শুনব কোলাহল।

মিনার আছে, পুকুর আছে—
সবুজবরন জল,
দেখতে দেখতে ধুয়ে যাবে
মনের যত মল।

ছবি: ধৃতিমান মুখোপাধ্যায়

খুকুর চুরি

সতীশ বিশ্বাস

হাত কেন তোর পিছনদিকে?
চোখ কেন তোর ভয়-ভয়?
একটা কোনও অপকম্ম
করেছিস তুই নিশ্চয়!

কী তোর হাতে? ভাইয়ের টেডি?
নাকি বোনের বার্বিডল?
কী রেখেছিস লুকিয়ে হাতে?
হাতিয়েছিস কার কী বল?

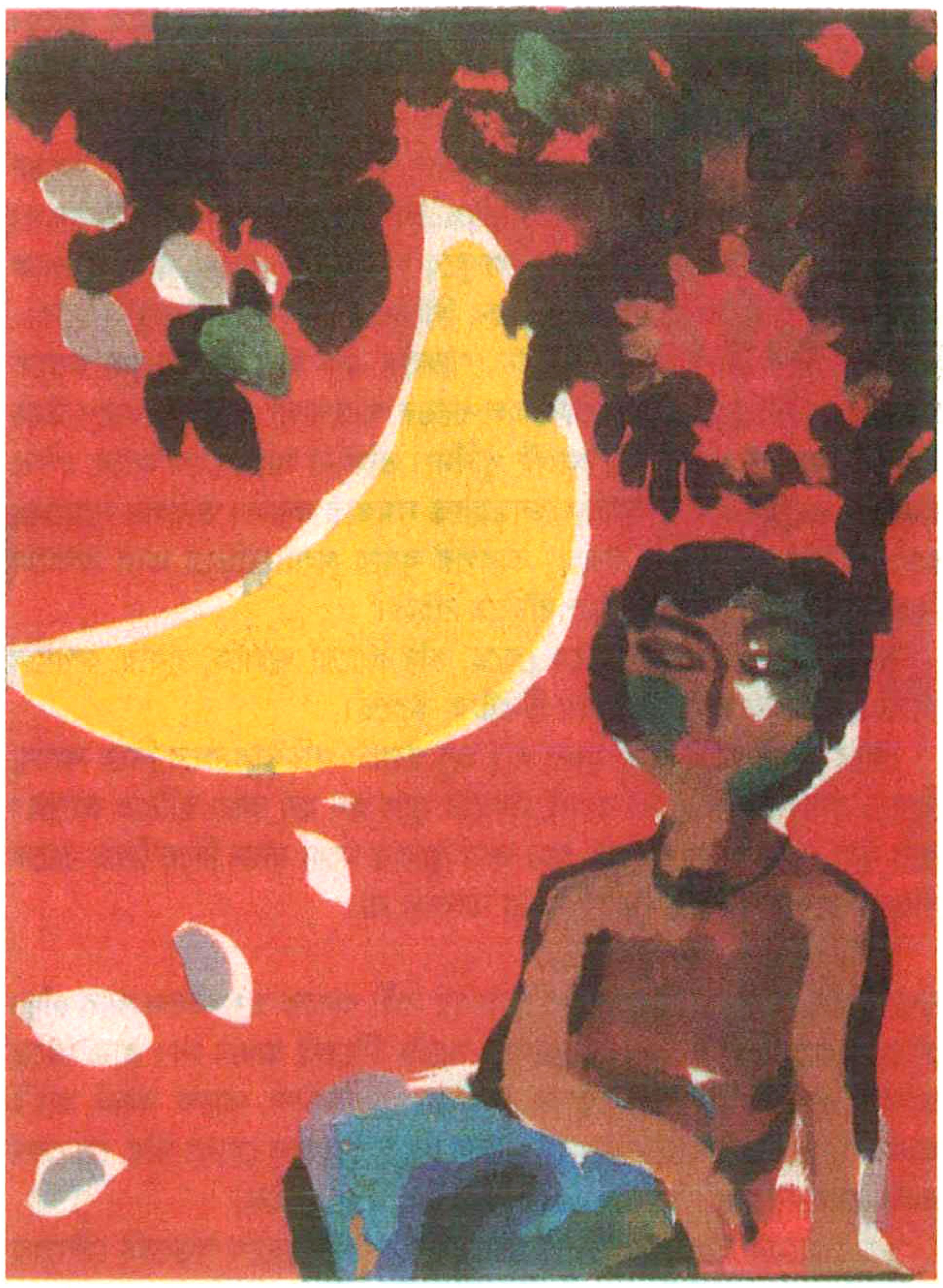
মা বলল চোখ পাকিয়ে
আচার নয়তো হাতে তোর?
তাহলে কি মালপো? নাড়ু?
চোখ কেন রে চোর-চোর?

কী রেখেছিস হাতে দেখি
নিলি নলেন গুড় কি?
ভয়ে ভয়ে খুকু দেখায়
'উড়কি ধানের মুড়কি'।

গৌর যাযাবর

(পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত)

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

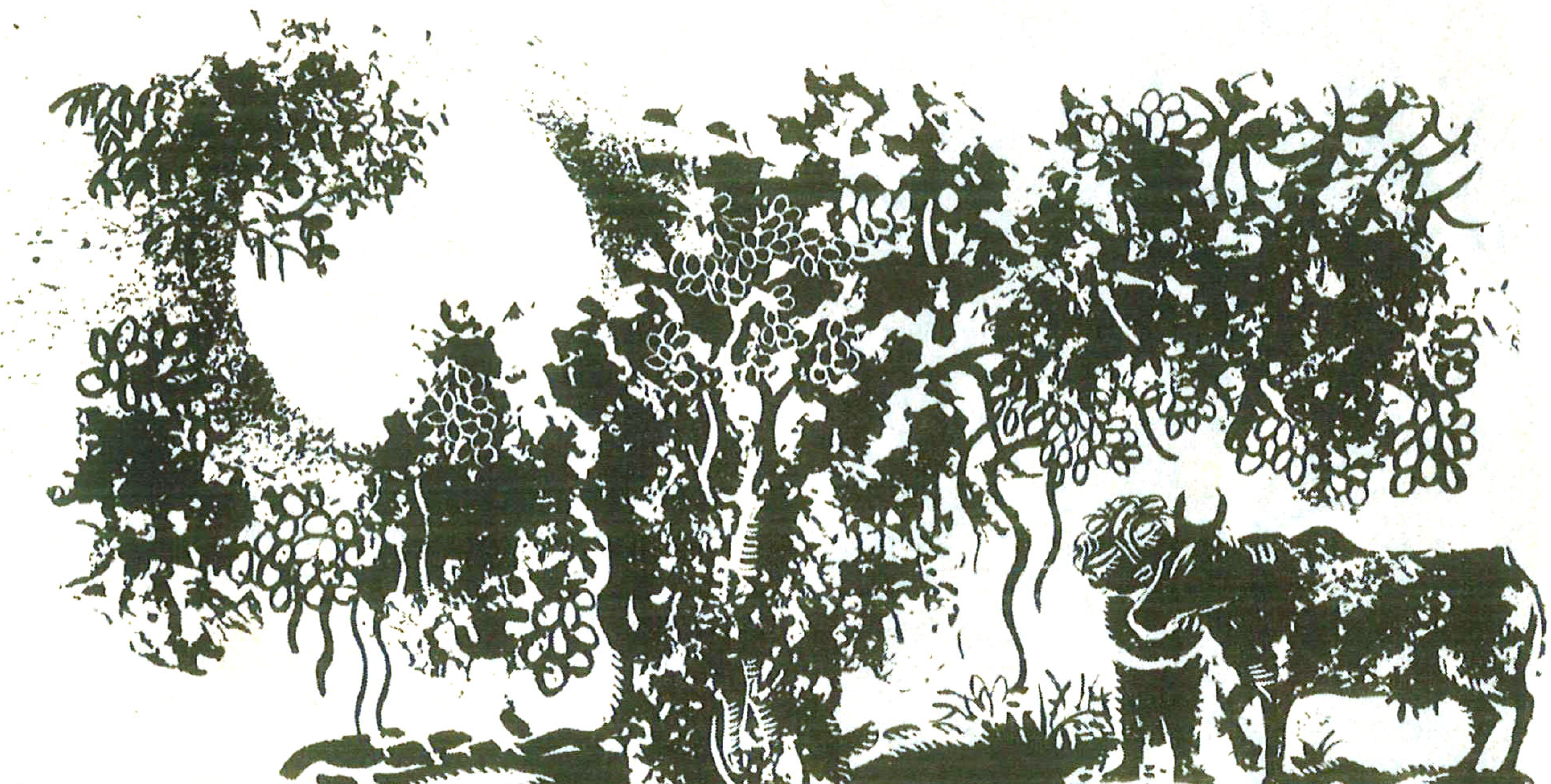


১

বুঝলি বুধা, তোকে ছেড়ে যেতেই যা একটু কষ্ট, নইলে কবেই যেদিকে দুচোখ যায় চলে যেতাম। তা, যেতে আমাকে হবেই। তাছাড়া আর উপায় কী বল। চোখের জল না ফেলে একবেলা আমাকে ভাত খেতে দেখেছিস? আর সে কী ভাত! শিলাবৃষ্টির সময় মাঠ কুড়িয়ে ঠিক যেন একমুঠো শিল মুখে তুলছি। খিদেয়, একেকদিন — তোকে আর বলতে লজ্জা কী — একেক দিন ভগবানকে বলেছি, আর জন্মে যেন তোর মতো গোরু হয়ে জন্মাই; অন্তত খোল-ভুষিটা তো জুটবে। বুধা রে, যার মা চলে গেল, বাপ চলে গেল — যাক, কাল দোল, দোলের দিন কোথায় আর অজানা পথে মুখে কালি, পিঠে গাধার ছাপ মেখে ঘুরে মরব, কালকের দিনটা যাক, পরশু থেকে আমি আর এ গাঁয়ের ত্রিসীমানায় নেই। বুধা রে, দেখ, এই দেখ, এখনই আমার চোখে জল এসে গেছে। তুই, আর এই বটগাছ — তোরা দুটিই ছিলি এ গাঁয়ে আমার পিছুটান।

বুধা বুঝুক না-বুঝুক, গৌরের যা কিছু কথা সব ওই গোরুর সঙ্গে। সাহাবাবুদের বড় ছেলের বাতিল গেঞ্জি ঝড়-খাওয়া কলাপাতার মতো গৌরের হাঁটু পর্যন্ত ঝুলছে। তারই এক ফালি তুলে ভালো করে চোখের জল মুছে গৌর ধরা গলায় বলল, পরশু থেকে তোরা কোথায় আর আমি কোথায়! কী করব বল, আমি যে নিরুপায়। কাল দোলের দিন আমি তেরোয় পড়ব। তাহলেই বোঝ, আদ্দেক জীবনই কেটে গেল সাহাবাবুদের গোলামি করে আর গালাগাল খেয়ে। আর যে কটা দিন আছি, একটু মনের মতো বাঁচতে ইচ্ছে হয় না? সন্ধের মুখে, নতুন জোছনায়, তকতকে দাওয়ায় বসে ধোঁয়া-ওঠা ভাত খেয়ে নিজের কাঁথাটিতে শুয়ে বাপ-মায়ের মুখ ভাবতে না পারলে, বুধা তুই-ই বল, মানুষ বাঁচে!

বুধা ঘাস খেতে খেতে একবার গৌরের কাছে আসে, আবার ঘাস খেতে খেতেই দূরে সরে যায়। এবার যেই কাছে এসেছে, গৌর হাত বাড়িয়ে বুধার গলা ছুঁতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ঝিঁঝির ডাক শুরু হতেই লাফিয়ে ওঠে। সর্বনাশ! বটগাছের ছায়া লম্বা হয়ে একেবারে খালপাড় ছুঁয়েছে! পশ্চিমে ঘুরে দ্যাখে,



তাল-সুপুরির সারির ফাঁক দিয়ে সুয্যিঠাকুর গনগনে চোখে চেয়ে আছে! গৌর তার মায়ের কাছে শুনেছিল, অস্তগামী সূর্য আসলে শিবঠাকুরের তৃতীয় নয়ন। কীর'ম ধ্বক-ধ্বক করে দেখিস নি?

ভয় শিবঠাকুরের তৃতীয় নয়নকে নয়, মা-বাবা বেঁচে থাকতে সঙের মেলায় সে অনেকবার শিবঠাকুর দেখেছে, শিবঠাকুরকে তার ভালোই লাগে। গৌরের আসল ভয় সাহাবাবুর রক্তচক্ষুকে। সন্ধে হতে চলল, এখনো গোরু গোয়ালে ওঠেনি, আজ নির্ঘাৎ গৌরের পিঠের চামড়া দিয়ে ডুগডুগি হবে।

গৌর লাফ-ঝাঁপ দিয়ে সব কটা গোরুকে এক জায়গায় করতে করতে হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল। চাঁদ খালপাড়ের গাছপালা ছেড়ে আকাশে উঠে এসেছে। মনে হয় কাল নয়, আজই পূর্ণিমা। ভয়ে না সাহসে কে জানে, গৌর হঠাৎ পেছন ফিরে অস্ত-সূর্যকে জোড়হাতে নমস্কার করল। তারপর সামনের আকাশে চাঁদকে নমস্কার করল। তারপর বুধার গলা জড়িয়ে তার কপালে নিজের গালটি চেপে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

যখন মুখ তুলল, সূর্য ডুবে গেছে, চাঁদ আরো জ্বলছে, বুধার কপালে গৌরের চোখের জল জোছনায় চিকচিক করছে।

গৌর এবার আর চোখ মুছল না। শুধু গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, বিদায়, বুধা। বিদায়, বট! বলেই উলটো মুখে হন হন করে হাঁটতে লাগল। তার বুধা, তার বটগাছ, তার গ্রাম তার বুকের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে তাকে পিছনে ডাকছে কিন্তু সে আর ফিরে তাকাল না।

প্রথমে মাঠ, তারপর রেল লাইন, তারপর সঙ্গী বলতে শুধু জঙ্গল আর চাঁদ। গৌর চলেছে তো চলেইছে, কোথায় যাচ্ছে নিজেই জানে না। গ্রাম ছেড়ে আসার দুঃখ আর সাহাবাবুদের গৃহত্যাগের আনন্দ তাকে আজ ভারি আনমনা করে ফেলেছে। গৌরের মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায়, সে বেশ একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে। যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁটছে।

হঠাৎ অনেক দূরে গাছপালার ফাঁক দিয়ে আগুন চোখে পড়তেই গৌরের ঘোর ভাঙে, সে সতর্ক হয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বুঝতে পারল, দোলের আগের দিন ছেলেরা 'বুড়ির ঘর' পোড়াচ্ছে। তারও হাত সুড়সুড় করে উঠল, কিন্তু এখন কি তার উৎসবে মাতলে চলে? রাত বাড়বার আগে একমুঠো ভাত আর একটু শোবার ব্যবস্থা না করতে পারলে মুশকিল। সারা রাত ধরে অচেনা জঙ্গলে হেঁটে বেড়ানো কোনো কাজের কথা না। পেটের মধ্যে তো এঁড়ে বাছুর দৌড়চ্ছে!



গৌর আগুনের ধার দিয়েই গেল না। ডাইনে ঘুরে জঙ্গল পেরিয়ে সামনেই দেখে একটা পুকুর। গ্রাম ছাড়বার সময় যে চাঁদটাকে সে নমস্কার করেছিল সেই চাঁদ দিব্যি এই পুকুরে নেমে পড়েছে। একদম জলের তলায়। পুকুর পাড়ের নারকোল গাছের সারিও উলটে গিয়ে জলের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গৌরের খুব ইচ্ছে হল, ঝাঁপিয়ে পড়ে বার কতক এপার-ওপার করে নেয়, কিন্তু সে ইচ্ছেও সে আপাতত তুলে রাখল। ওই দিকে ছেলেরা বুড়ির ঘর পোড়াচ্ছে, এইখানে পুকুর, তার মানে, যাক বাবা, একটা গাঁ তো পাওয়া গেছে! আর গাঁ যখন, কেউ না কেউ আশ্রয় দেবেই। পুকুর তো আর রাতারাতি পালাচ্ছে না!

গৌরের এইসব চিন্তা বা অনুমান কখনো ভুল হয় না। পুকুর ছাড়িয়ে এ-গাছতলা সে-গাছতলা দিয়ে কিছুটা এগোতেই চোখে পড়ল দূরে দূরে দশ বিশটা কুঁড়েঘর যে যার সামনের উঠোনে ঠাণ্ডা ছায়া ফেলে ঠিক যেন কোল পেতে বসে আছে।

গৌর সবচেয়ে কাছের বাড়িটার উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতেই ধপধপে উঠোনে তারও ছায়া পড়ল। সে আশ্চর্য হয়ে দেখল, এ বাড়ির উঠোনের সঙ্গে তার ছায়াটার যেন অনেক দিনের জানাশোনা! ভারি মিশ খেয়ে গেছে।

কিন্তু পরের মুহূর্তেই যা ঘটল, গৌরের কান একেবারে খাড়া।

ঘরের মধ্যে হেঁড়ে গলায় কে একজন বলে উঠল, বাবা! পচাকে আমি পাকের ঘরের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে এলাম, আপনি লাঠি নিয়ে চলুন।

— ফের চুরি করেছে?

নিশ্চয় বাবার গলা। একদম মেঘের ডাকের মতো।

হেঁড়ে গলার লোকটা বলল, হ্যাঁ বাবা। সাঁঝ লাগতেই কার বাড়ি থেকে গামছা, সাবান আর একটা ফুল প্যান্ট ঝেড়ে এনেছে!

— ওর ভাগ্যে এবছর আর দোল খেলা নেই। আজই ওর শেষ দিন! তুই যা, আমি একটু তামাক খেয়ে আসছি।

গৌরের পা মাটিতে সেঁটে গেছে। সে দু-কান খাড়া করে তামাকের গুড়ুক-গুড়ুক শুনছে আর ভাবছে, এরপর কী? লোকটাকে সত্যিই কি মেরে ফেলবে না কি? এরকম ঘটনার পর এ বাড়িতে আশ্রয় চাওয়াও তো সহজ নয়।

— চোরপুত্রের জনক হওয়ার চেয়ে আমি আজ পুত্রহারা হব! প্রথমে ডান হাত পাত —

এ সেই মেঘের ডাক।

এবারের গলা নিশ্চয়ই পচার। লোকটা ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে বলল, এবারটা খালি ক্ষমা করুন বাবা। ও দাদা, হাতের বাঁধন খুলে দে, বাবার পায়ে ধরব। এবারটা আমায় ছেড়ে দিন। আর কখনো চুরি করব না। বাবা, বাবা গো, এ আমার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞে।

— প্রতিজ্ঞা তো গত হপ্তায়ও করিছিলি। কচি, গত হপ্তায়ও ও ভীষ্মের নাম নেয় নি?

হেঁড়ে গলার লোকটা বলল (এ-ই তাহলে এনার বড়ছেলে, পচার দাদা) — না বাবা, সেবার যুধিষ্ঠিরের নাম নিয়ে প্রতিজ্ঞে করেছিল।

— চোরের মুখে ভীষ্ম-যুধিষ্ঠিরের নাম! বল তোর জীবনের শেষ ইচ্ছে কী? একটু আবির খেলতে চাস তো দোলের আগেই খেলে নে। তোর আয়ু আর আধ ঘণ্টা। পচা কঁকিয়ে উঠল, এবারটা খালি ছেড়ে দিন বাবা। আর আমি চুরি করব না। ওরে দাদা, বাবার চরণ-দুটি একবার ছুঁতে দে।

— কচি, সাবধান! বাঁধন না খোলে! তোর মা ঘাট থেকে না ফেরা অব্দি অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

বাবার শেষ রায় শুনে পচা এবার আকাশ ফাটিয়ে ডেকে উঠল — ও মা! মা গো! মা আমার! পচার এই গলা ছেড়ে মা ডাক শুনে গৌরের বুকের মধ্যেটা মুচড়ে উঠল।

গৌর শুনল, বাবা বলছে — কচি, ঘর থেকে আমার হুঁকোটা এনে দে। তামাক পালটে দিস।

এরপর শুধু পচার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আর ওদের বাবার গুড়ুক-গুড়ুক তামাক খাওয়া ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো শব্দ নেই।

গৌর ভাবছে, নিজের গ্রাম ছেড়ে এসে এ কোন বিপাকে পড়া গেল! হঠাৎ পেছনে ভিজে কাপড়ের ছপ ছপ শুনে মুখ ঘুরিয়ে দেখে, কাদের যেন মা — বোধহয় পচা কচিদের মা-ই হবে, উঠোনের এক ধার দিয়ে বাড়িতে ঢুকে গেল।

ওদিকে বাড়ির মধ্যে ঠিক তখনই তামাক খাওয়ার শব্দ থেমে গেছে আর পচা, বোধহয় মাকে দেখেই, নতুন করে কেঁদে উঠল — মা, মা গো! আর তোমায় মা বলে ডাকতে পাব না গো!

মায়ের গলা চিলের ডাকের মতো। গৌর শুনল, তিনি গলা চিরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছেন — ফের, ফের কচি, ঘরের খুঁটির সঙ্গে পচাকে বেঁধেছিস! ঘর যদি ভেঙে পড়ে তো আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

— এঃ, চোরের মার বড় গলা! ন্যায় বিচারে নাক গলাতে এসো না বলছি বউ! পচাকে আজ আমি নিজের হাতে শেষ করে শ্মশানে নিয়ে যাব। তুমি ভিজে কাপড় ছেড়ে এসে ওকে শেষ দেখা দেখে নাও।

গৌর কতক্ষণ আর সহ্য করবে, এবার সোজা বাড়ির ভেতরে ঢুকে ওপাশের উঠোনে লাফিয়ে পড়ে পচার বাবাকে বলল, এইবারটা এনাকে ছেড়ে দিন, আমি এনাকে বাল্মীকি-আখ্যান গেয়ে শোনাব, দেখবেন তিনি আর কখনো চুরি করবেন না।

পচার বাবা ধপধপে শাদা চুল-দাড়ি। বড় ছেলে কচির চুলও অর্ধেক শাদা। পচা ঘরের খুঁটির সঙ্গে গোরুর দড়ি দিয়ে বাঁধা। তার মাথার চুলে সবে পাক ধরেছে।

পচার বাবা হুঁকো রেখে লাঠি তুলেছিলেন, গৌরকে পুরো এক মিনিট ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বললেন, পচার চুরির কথা তুই জানলি কী করে? মৃত্যুদণ্ডের কথাই বা তোকে কে বলল?

গৌর এই সুযোগে ধাঁ করে বুড়োকে একটা প্রণাম ঠুকে দিয়ে বলল, আজ্ঞে, আমি এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলাম।

— কেন বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলি?

— আজ্ঞে, আপনাদের এখানে এসেছিলাম একটু আশ্রয়ের খোঁজে।

— নাম?

— আজ্ঞে, গৌর।

— কী বললে বাবা? গৌর? দোলপুন্নিমের আগের রাতে তুমি বাবা গৌর এলে গরিবের কুঁড়েয়। ওরে কচি, ওরে পচা, এক্ষুনি জাল নিয়ে পুকুরে ছোট। বড় দেখে একটা কাতলা ধরে আন শিগগির। আহা রে, মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে।

বলতে বলতে কচি-পচার মা গৌরের হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে আসন পেতে তাকে বসিয়ে দিল।

পচা কান্না ভুলে বলে উঠল, দাদা আমার বাঁধন খুলে দে — বাবা, আপনি দাদাকে বলুন।

কচি-পচার বাবা এগিয়ে গিয়ে নিজের হাতে পচার বাঁধন খুলতে খুলতে বললেন, যা ব্যাটা, বেঁচে গেলি। ঘরে অতিথি এসেছে, তোর দণ্ড মকুব হয়ে গেল। এই যে বাবা, কই, তোমার বাল্মীকি আখ্যান ধরো দেখি।

— মা যে কচিবাবু-পচাবাবুকে মাছ ধরতে পাঠাচ্ছেন! কাজ-কম্মো মিটিয়ে, একেবারে দুটি শাকান্ন খেয়ে গান ধরলে হয় না?

গৌর অনেক দিন পরে প্রাণের সুখে পেট ভরে ভাত খেল। তারপর চতুর্দশীর খোলা উঠোনে চোখ বুজে বসে দস্যু রত্নাকরের মহাকবি হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত গেয়ে শোনাল। কথা ও সুর তার আগাগোড়া মুখস্থ। গলাটিও ভারি মিষ্টি।

গান শেষ করে চোখ খুলে দেখে সকলের চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে, কেবল পচাবাবু বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, গান থামতেই ধড়মড় করে জেগে উঠে চোখ রগড়াচ্ছে। কী ভাগ্যি, গৌর ছাড়া আর কেউ দেখে ফেলে নি। ওরা ভেবেছে, পচাও বুঝি তাদের মতোই কাঁদছে।

গ্রাম ছেড়ে আসার সময়, পথে, গৌর একটা ব্যাপারে মন ঠিক করে ফেলেছে, কারো বাড়িতেই সে একদিনের বেশি আশ্রয় নেবে না। পৃথিবীতে



বাড়ি তো আর কিছু কম নয়। আকাশের তারাদের চেয়ে বেশিই হবে হয়তো। তাছাড়া সে-ও তো আর লক্ষ লক্ষ দিন বেঁচে থাকবে না।

পরদিন সকালে আশ মিটিয়ে পুকুর সাঁতরে, পেট ভরে পান্তা-টান্তা খেয়ে গৌর ছেলেদের দোলের রং এড়িয়ে সবে নতুন একটা জঙ্গলের পথ ধরেছে, হঠাৎ সামনের গাছ থেকে ঝুপ করে কে লাফিয়ে পড়ল। কে রে বাবা! আর কেউ না, পচা। মুখে মিটিমিটি হাসি নিয়ে গৌরের কাছে এসে বলল, ভারি বুদ্ধি তোর। আমার দলে আসবি? আমি একটা ডাকাতের দল গড়ব ভাবছি।

গৌর গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, হঠাৎ আপনার এ দুর্মতি কেন?

— ছিঁচকে চুরি করে এ-বয়সে বাবার মার আর সহ্য হয় না।

গৌরের ইচ্ছে হল, বলে, কাল আপনার মৃত্যুদণ্ড হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু যতই রাগ হোক, একথা কি আর সত্যিই কাউকে বলা যায়! সে একটু দাঁত চেপে বলল, এসব বদ খেয়াল ছেড়ে মানুষের মতো বাঁচতে চেষ্টা করুন।

পচা ট্যাঁক থেকে একটা বিড়ি বের করে দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে নিয়ে বলল, ডাকাতি করে বস্তা বস্তা টাকা হলে তখন কত সুখ একবার ভেবে দেখেছিস?

গৌর তার নাকের সামনে থেকে পচার বিড়ির ধোঁয়া তাড়াতে তাড়াতে বলল, ধ্যুর! সন্ধেবেলা চাট্টি গরম ভাত খেয়ে নিজের কাঁথায় শুয়ে বাপ-মায়ের মুখ ভাবতে পারার মতো সুখ আর পৃথিবীতে আছে নাকি! এত বয়েস হল আপনার, আপনি লোকটা কিন্তু বড্ড বোকা!

বলে গৌর আর দাঁড়াল না, তার চারপাশের পৃথিবী দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল। সন্ধে হবার আগে রাতের মতো একটু আশ্রয় আর একমুঠো ভাত ঠিকই হয়ে যাবে।

২

দূর থেকে একটা বাড়ির সামনের দিকে চোখ পড়তেই গৌর দাঁড়িয়ে পড়ল। উঠোন তো না, যেন ভগবানের হোলিখেলা! হলুদ গাঁদা, চন্দন গাঁদা, মোরগঝুঁটির হুলুস্থুলু রঙে একেবারে ভেসে যাচ্ছে। উঠোনের এধার থেকে সরু একটা পথ উঠোনভরা রং চিরে ওধারে বাড়ির দরজা পর্যন্ত চলে গেছে। পথের ওপর একটু দূরে দূরে একটা করে থান ইট পাতা।

বাড়িটা দেখেই গৌরের ভারি আনন্দ হল, তার ওপর এই সরু পথ, চলতে গেলেই গায়ে-মুখে ফুলের টোকা লাগে! গৌর ইট থেকে ইটে জোড় পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে দরজার সামনে পৌঁছে দুষ্টুমি করে সুরেলা গলায় হাঁক পাড়ল — মা, দুটি ভিক্ষে পাই?

ভেতর থেকে কোনো সাড়া নেই। গৌর এবার আরো গলা তুলে বলল, বাড়িতে কেউ আছেন?

এবারও কেউ সাড়া দিল না। তার বদলে, গৌর এতক্ষণে খেয়াল করল, বাড়ির ভেতরে কে যেন ক্ষীণ গলায় ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। অল্পবয়েসী বউ-মেয়ের গলা। কাঁদছে খুব চাপা স্বরে, যেন গলা খুলে কাঁদবার আর ক্ষমতা নেই।



গৌরের মনের নাচন থমকে গেল। যদিও সন্ধে হতে এখনো খানিকটা বাকি, অন্য কোথাও আশ্রয়ের চেষ্টা করার সময় চলে যায় নি, তবু তার খুব ইচ্ছে, আজকের রাতটা এ-বাড়িতেই কাটায়। বাড়িতে আর কোনো লোক নেই নাকি?

গৌর আরেকবার গলা তুলে ডাকতে যাচ্ছে, হঠাৎ ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল, একটা বুড়ি লাঠি ঠুকে-ঠুকে এদিকেই আসছে। কাছে এসে দরজা পুরো না খুলেই বুড়িটা অদ্ভুত গলায় বলল, তুমি আজ যাও বাছা।

— আজকের রাতটা খালি থেকে যেতাম।

— কে তোমাকে আজ একমুঠো রেঁধে দেবে বাবা! আমাদের বুক খালি হয়ে গেছে গো! বাড়ি শ্মশান হয়ে গেছে!

বলেই পরনের থান দিয়ে মুখ চেপে ধরে বুড়ি হু-হু করে কেঁদে উঠল।

গৌরের মন সজাগ হয়ে যায়। সে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ে বুড়ির হাত ধরে বলল, কী হয়েছে, আমাকে খুলে বলুন।

— আমার বড় নাতিকে সাপে কেটেছে। গাঁয়ের সব্বাই মিলে তাকে নিয়ে গেল গো, কলার ভেলায় চড়িয়ে গাঙে ভাসিয়ে দেবে।

যত কথা, তত কান্না। বলতে বলতে বুড়ি বসে পড়ে — গত শীতেও ও-গাঙে কুমির দেখা গেছে। কত লোক দেখেছে। সেই গাঙে ওরে ভাসিয়ে দেবে! ও নবীন, নবীন রে!

সাপে কাটা গৌরের কাছে কিছু নতুন ব্যাপার নয়। তাদের গাঁয়ে সে অনেক সাপে-কাটা রুগি দেখেছে। বেশির ভাগই মরে যায়, আবার কেউ কেউ বাঁচেও। সে বুড়ির সামনে বসে পড়ে বলল, দংশন করেছে কখন?

— কাল রাতে বাবা। ওঝা এসে বাঁধন দিল, সারারাত কত ঝাড়ফুঁক করল, চুল ধরে কত ঝাঁকাল, দাদা আমার চোখ মেলল না। কী বলব বাছা, এই ফাগুনেই ওর বে দিয়েছিনু, কচি বউটা কাটা কলাগাছের মতো কেঁদে ভাসাচ্ছে!

গৌর শুনেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল, গাঙ এখান থেকে কদ্দূর? ওনারা কোন পথে গেছেন?

পথ বুঝে নিয়ে গৌর এক-এক লাফে তিন-চারটে করে ইট পেরিয়ে রাস্তায় পড়েই সোজা গাঙের দিকে দৌড়।

গাঙের তীরে পৌঁছে এক জায়গায় পাশাপাশি তিনটে অশথগাছ আর তার তলায় মানুষের জটলা দেখে গৌর দাঁড়িয়ে পড়ল।

লোকেদের কারো মুখে কোনো কথা নেই। মুখ নিচু করে তারা কলাগাছের ভেলা তৈরি করছে। তারই বয়েসী একটা ছেলে শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

মাথা কাটা অনেকগুলো কলাগাছ পাশাপাশি সাজিয়ে শক্ত করে বেঁধে ভেলা বানানো হচ্ছে। সাপে কাটা ছেলেটিকে একটু দূরে অশথগাছের গোড়ায় শোয়ানো হয়েছে। তার শিয়রে কয়েকজন বসে আছে। একজনের মাথায় একটা ছাতা।

যারা ভেলা বাঁধছে, গৌর তাদের কাছে গিয়ে বলল, ভেলা একটু বড় করে করুন, আমিও এনার সঙ্গে যাব।

লোকগুলো হাতের কাজ থামিয়ে ভারি অবাক হয়ে গৌরকে দেখল। তাদের একজন বলল, তুমি কে বাবা? সাপে কাটা মানুষের ভেলায় কি জ্যান্ত মানুষ যেতে পারে?

গৌর ঝুঁকে পড়ে ভেলার বাঁধন দেখছিল, বলল, আমার নাম গৌর। ওনার নাম তো নবীন, আমি ওনাদের বাড়ি গিয়েছিলাম, এই বিপদের কথা শুনে ছুটে এসেছি। আমি এনার সঙ্গে থাকব।

আরেকজন লোক বলল, সে কি সম্ভব? সে যে বড্ড কঠিন কাজ।

কিন্তু কেউ একজন সঙ্গে না গেলে, নদীর জল আর ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটায় নবীনদা বেঁচে উঠলে কাউকে না দেখে তখন খুব মন খারাপ লাগবে। এত বড় গাঙে, একেবারে একা — তাছাড়া ভাবুন, তখন যদি মাথার ওপর তারাভরা আকাশ থাকে?

একজন, একটু বুড়ো মতন লোক, ভেলা বাঁধার কাজে হাঁপিয়ে গিয়ে বিড়ি ধরিয়েছিল, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, তোমার কথাগুলোন ভালো, দামি কথা বটে, কিন্তু তুমি একা ওই ভেলায় নবীনের সঙ্গে যেতে পারবে?

— খুব পারব। আপনারা কিছু চিঁড়ে-মুড়ি সঙ্গে দেন।

— চিঁড়ে-মুড়ি দেব, খই-মুড়কি দেব, অসময়ের পাটালিও খানকতক দেব, তা বাদে জল খাওয়ার ডাবও দেব এক কাঁদি।

ছাতা-মাথায় লোকটা এগিয়ে এসে গৌরের কথা শুনছিল, বলল, আমার ছাতাটাও দেব, রোদ-বৃষ্টিতে মাথায় দিয়ো।

যে লোকটা চিঁড়ে-মুড়ি-পাটালির কথা বলেছিল, সে এবার ছাতা-মাথায় লোকটাকে দেখিয়ে গৌরকে বলল, এ হল গিয়ে নবীনের জ্যাঠা। বাবাই বলতে পারো। ছোট্টবেলা থেকে নবীনকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। তা, হ্যাঁ বাবা, তোমার বাপ-মা তোমাকে যেতে দেবে?

— বাপ-মাকে বুকে নিয়েই বেরিয়েছি। তারা এখন স্বগ্যে। তাদের মুখ দুখানি আমি রোজ রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবি। ভেলায় বসেও ভাবব।

— আহা, কথাগুলোন যেন জিরেন কাটের রস! কথা তো নয়, মনে হয় যেন শান্তিজল ছেটাচ্ছে গো!

হাতে হাতে ভেলা তৈরি হয়ে গেল। গৌর বসলে একদিকে ভার পড়ে যাতে ভেলা না ডুবে যায়, একটা ভাঙা নৌকো কেটে তারও ব্যবস্থা করা হল। একজন গিয়ে ভেলার এক মাথায় দুটো কলাগাছের ফাঁকে খোলা ছাতার বাঁটের দিকটা গুঁজে দিল। গ্রামের লোক চিঁড়ে, মুড়ি, খই-পাটালি, তিলের খাজা, ডাবের কাঁদি বয়ে এনে ভেলায় সাজিয়ে রাখল। সঙ্গে কলাই-করা থালা, গেলাস, ডাব কাটার ছুরি, আর একটা দাঁড়। সবশেষে জোয়ান চেহারার কয়েকজন মিলে ধরাধরি করে নবীনকে শুইয়ে দিল ভেলার ওপর। গৌরের বয়েসী ছেলেটা প্রথম থেকেই কাঁদছিল, নবীনকে ভেলায় শোয়াচ্ছে দেখে 'ও দাদা গো' বলে হুড়মুড় করে নদীর পাড় ভেঙে নীচে নেমে এসে একহাঁটু জলে দাঁড়িয়ে কান্নার সঙ্গে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল।

গৌর ততক্ষণে ভেলায় উঠে বসেছে। যারা জলে নেমে ভেলার মাথার দিকটা ধরে ছিল তারা হঠাৎ 'জয় মা বিষহরি, জয় মা মনসা' বলে জোরে ধাক্কা দিয়ে ভেলাটাকে গাঙের ভেতরের দিকে ঠেলে দিল। নবীনের জ্যাঠাও জলে নেমে এসেছিল, গলা তুলে গৌরকে বলল, বাবা গৌর, নবীনকে দেখো বাবা, বেঁচে উঠলে ফিরিয়ে এনো। — ও বাবা নবীন, তুই কোথায় চললি বাপ!

ধাক্কা খেয়ে ভেলাটা স্রোতের মুখে অনেকটা দূরে চলে এসেছে,





হঠাৎ গৌর দেখল, নবীনদার ভাই ভেলা লক্ষ করে সাঁতার দিতে দিতে এগিয়ে আসছে।

পাড়ের লোকেদের চোখে পড়তেই তারা চেঁচিয়ে উঠল, ও প্রবীণ, প্রবীণ! ফিরে আয়, ফিরে আয়! প্রবীণ —

প্রবীণ ফিরছে না দেখে দুজন লোক জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুব সাঁতারে প্রবীণের কাছে এসে ভেসে উঠল, তারপর দুজনে মিলে প্রবীণকে জাপটে ধরে জোর করে তাকে ডাঙার দিকে নিয়ে চলল।

গৌর এতক্ষণে দাঁড়টা জলে নামিয়ে ধীরে ধীরে ভেলা বাইতে লাগল। পাড়ের লোকজন, ঝোপঝাড়, কুঁড়েঘর, অশথগাছ এক পা এক পা করে পিছোতে পিছোতে খুব দূরের একটা দেশ হয়ে গেল। ততক্ষণে গাঙের জল শেষবারের মতো রাঙিয়ে, তারপর রাঙা জল কালো করে অস্তগামী সূর্যও ঝাপসা অশথগাছগুলোর আড়ালে চলে গেছে।

গৌর বসেছে নবীনের পায়ের দিকে, খোলা ছাতাটার নীচে। নবীনের কত আর বয়েস, খুব বেশি হলে গৌরের চেয়ে পাঁচ-ছবছরের বড়। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সারাদিন হই-হুল্লোড় করে নবীনদা যেন না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

গৌরের মনে ভয়ডর বলে কিছু নেই, এক সাহাবাবুকে ছাড়া। তা সে-ভয় কবেই শেষ হয়ে গেছে। গাঙের জল ছলাৎ ছলাৎ করে গৌরকে ডাকতে ডাকতে কোথায় কোনদিকে নিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে গৌরের কোনো ভয়-ভাবনা নেই। অন্ধকার আকাশে রাক্ষসের বাঁকা একটা দাঁতের মতো একফালি চাঁদ দেখতে দেখতে গৌর ভাবল, গান ধরলে কেমন হয়? এতক্ষণ ধরে একদম একা, কথা কইবার দ্বিতীয় কোনো লোক নেই, এ ভারি বিচ্ছিরি ব্যাপার। কথাটা মনে হতেই গৌর বাঁ হাতের তালুতে একটা কান চেপে সুর করে গাইতে শুরু করল —

উচ্ছে তিতা, নিমের পাতা, আরো যে কত তিতা
রাবণ রোজ দুবেলা দেয় — দাঁতে না কাটেন সীতা।
শ্রীরাম আমার স্বামী গো, আমার জনকরাজা পিতা
আছোলা বাঁশে, শিয়ালকাঁটায় বানাচ্ছে তোর চিতা।
দাঁত কিড়মিড় করে রাবণ, বড্ড অহংকার!
রাজার দোষে দেশ ডোবে হায়, ডুববে গো লংকা।
লংকাদেশের কলঙ্ক এই মস্ত লোভী রাবণ
লোভ করেছে, লোভের কুফল করেনি অনুধাবন।

গৌর বিভোর হয়ে গান গাইছিল, হঠাৎ কিসের একটা ফরফর শব্দে তার ঘোর ভেঙে গেল। গান থামিয়ে কান খাড়া করে শব্দটা শোনবার চেষ্টা করল। নবীনদা বেঁচে উঠল না তো? খুব সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে সে নবীনের মাথার কাছে গিয়ে তার নাকের কাছে কান পাতল — কোনো শব্দ নেই। হাতের উলটো পিঠ কপালে রেখে পরীক্ষা করল, একটামাত্র আশার কথা, শরীরে এখনো সামান্য তাপ আছে।

শব্দটা আরেকবার হতেই গৌর ভেলার ডানদিকে মুখ ফেরাল। শব্দটা ওইদিকেই হচ্ছে। আবছা অন্ধকারেও গৌর দেখল, ভেলার সঙ্গে বেশ খানিকটা কচুরিপানা লটকে গেছে। ভেলার সঙ্গে সঙ্গেই ভেসে চলেছে। কচুরিপানার মধ্যে বিঘৎখানেক লম্বা একটা মাছ আটকা পড়ে গিয়ে জলে লাফিয়ে পড়ার জন্য ছটফট করে উঠছে — শব্দটা তারই।

গৌর নিজের জায়গায় ফিরে এসে দাঁড় দিয়ে ঠেলে মাছটাকে জলে নামিয়ে দিল। তারপর কচুরিপানার ঝাঁকটাকে সরাতে সরাতে গুনগুন করে গাইতে লাগল —

হলেই তুমি তোমার দেশের মালিক
পুরবে খাঁচায় সামনে পেলেই শালিক?
ওরে ও রাবণরাজা ভাই —
বড্ড তোমার খাঁই।

— কে যায়? পালাবার চেষ্টা করলেই গুলি করব — নৌকো ভেড়াও! নাম বল, নিবাস বল!

ছবি: যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

এরপর আগামী সংখ্যায়



কথামালা যুগে যুগে

সুনির্মল চক্রবর্তী

যিশুর জন্মের আনুমানিক ছ'শো কুড়ি বছর আগে গ্রিস দেশের ফ্রিজিয়ায় এক পণ্ডিত জন্মেছিলেন। তাঁর নাম ঈশপ। তাঁর গল্প বলার অসাধারণ ক্ষমতার কথা লোকমুখে সারা গ্রিস দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। লোকমুখে প্রচলিত তাঁর গল্প অনেক পরে সংগ্রহ করে ব্যাবেরিয়াস গ্রিক ভাষায় পদ্যে লেখেন। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় ঈশপের গল্প প্রকাশিত হয় তারও অনেক পরে।

বিদ্যাসাগর ঈশপের প্রায় আড়াইশো গল্পের মধ্যে থেকে মাত্র ৮৫টি গল্পের অনুবাদ করেন। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে 'কথামালা' নাম দিয়ে তা প্রকাশও করেন।

'কথামালা' অনুবাদ গ্রন্থ হলেও, তা মৌলিক গল্পের মতোই মনে হয়েছে। সেকালের শিশুদের কাছে তা ছিল স্বাদু, সুখপাঠ্য এবং আনন্দদায়ক।

একালের শিশুদের কথা চিন্তা করে গল্পগুলি নতুন ভাবে পরিবেশন করার চেষ্টা করেছি।

এক সিংহ, তিন ষাঁড়



তারা ছিল তিনটে ষাঁড়। তাদের মধ্যে ছিল খুব ভাব। তারা একসঙ্গে চলত, একসঙ্গে বসত, একসঙ্গে মাঠে এসে সবুজ ঘাস খেত, মাঠে চরে বেড়াত।

এদিকে জঙ্গলে ছিল এক সিংহ। তার খুব ইচ্ছে তিন ষাঁড়কে কাছে পেয়ে ভোজ সারে। কিন্তু তার ইচ্ছে পূর্ণ হচ্ছিল না। কারণ হল, তিনটে ষাঁড়ই ছিল খুব শক্তপোক্ত। তারা সবসময় একসঙ্গে থাকত। তিনজনের ঘাড় ভাঙা সহজ ছিল না।

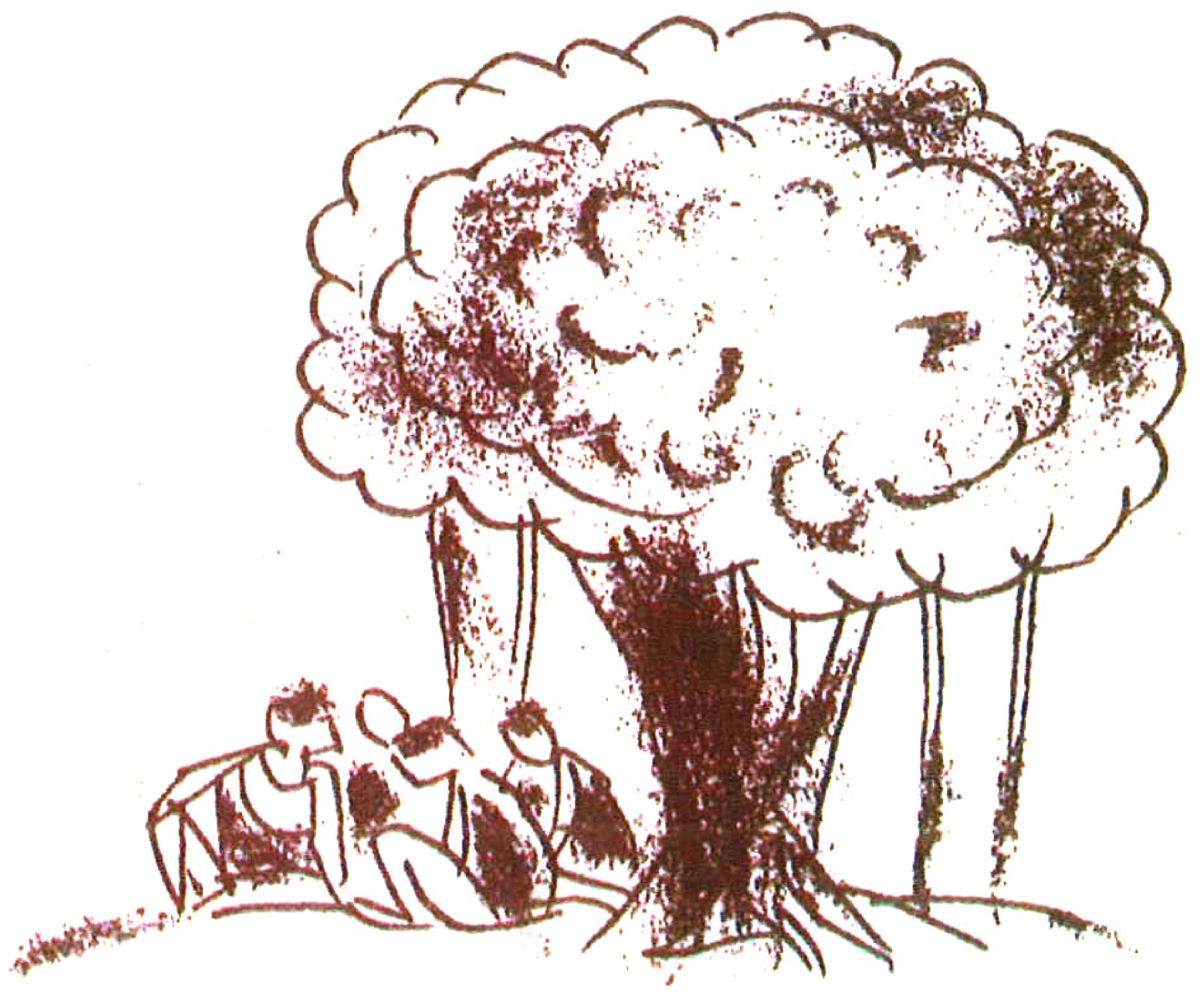
সিংহ ভাবতে লাগল কী করে ওদের আলাদা করা যায়।

একদিন কী করে কী করে তিন ষাঁড়ের মধ্যে ঝগড়া বাধল। এমন ঝগড়া বাধল যে ঝগড়া থামলেও কেউ কারও মুখ দেখত না। মুখ দেখাদেখি বন্ধ হল। ভাব-ভালোবাসা বলে কিছুই রইল না। সবাই আলাদা হয়ে মাঠে চরতে লাগল।

সিংহ তো এটাই চাইছিল।

একদিন সুযোগ বুঝে সিংহ একে একে তিনজনের ঘাড় মটকাল। তারপর তিনজনকে মেরে ইচ্ছেমতো খাওয়াদাওয়া সারল।

বটগাছের আক্ষেপ



এক দিন। গরমের দিন। দুপুরের রোদ চারদিকে। কয়েকজন পথিক হাঁটতে হাঁটতে খুব ক্লান্ত হল।

কাছেই ছিল এক বটগাছ। তারা এসে পৌঁছল সেখানে। গাছের ছায়ায় বসে পড়ল সবাই। তারপর সেখানে বিশ্রাম করতে লাগল।

কিছু পরেই তাদের শরীর ঠান্ডা হল। ক্লান্তিও দূর হল। তখন তারা খোশমেজাজে এ ওর সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

তাদের মধ্যে একজন বটগাছটাকে ভালোভাবে দেখে বলল, বুঝলে, এ গাছ আসলে কোনও কাজের নয়। এ গাছে ভালো ফুল হয় না, আবার ভালো ফলও হয় না। তার মানে হল, এ গাছ মানুষের কোনও উপকারে আসে না।

বাকি যারা ছিল তারা লোকটার কথায় সায় দিতে লাগল।

বটগাছ তখন আক্ষেপ করে বলল, মানুষ বড় স্বার্থপর। আমারই ছায়ায় বসে, আমারই বদনাম করছে।

ছবি: যুধাজিৎ সেনগুপ্ত


ভ্রমণ
পুজোর ভ্রমণ গাইড
ভ্রমণ
বেরিয়ে পড়ার আসল গাইড, ঘরে বসেও মানসভ্রমণ
No. 1 Travel Magazine in India
with the largest readership*
*Source: IRS (Indian Readership Survey) 2011 Q4
Website: www.bhraman.com □ www.ebhraman.com